জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

অপরাজেয় বাংলা

সাবাস বাংলাদেশ

বিজয় '৭১

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি ভাস্কর্য

ক. অপরাজেয় বাংলা: অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নির্মিত যাতে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ ১৯৭৯ সালে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে এটি অবস্থিত ।

খ. সাবাস বাংলাদেশ: সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ভাস্কর্য যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকীরূপ। ১৯৯১ সালে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত।

গ. বিজয় '৭১: মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্তপ্রতীক এই ভাস্কর্যটি। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অবস্থিত। ভাস্কর্যটির শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ২০০০ সালে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

শিল্প ও সংস্কৃতি

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মঞ্জুর আহমদ
তানজিল ফাতেমা
শেখ নিশাত নাজমী
কামরুল হাসান ফেরদৌস
মোঃ রেজওয়ানুল হক
মুহাম্মদ রাশীদুল হাসান শরীফ
তানজিনা খানম
সুলতানা সাদেক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

রিকশা এপ্লিক আর্ট

মদন দে

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অর্ন্তবর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকটির শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলাদেশে রয়েছে অনেক জাতিসত্তা আর সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের দেশের এই নানা জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। হরেক রকমের সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন আমাদের দেশকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের সংস্কৃতি হলো আমাদের শিকড়। শিকড়ের সাহায্যে গাছ যেমন পুষ্টি পায়, বেড়ে ওঠে তেমনি আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে শিকড় বা মূল হিসেবে গণ্য করে হয়ে উঠব বিশ্বনাগরিক।

‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্গভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতিই হলো আমাদের আনন্দ আর শিল্প সৃষ্টির অপার ভুবন। প্রকৃতিতে রয়েছে প্রাকৃতিক নানা বিষয়বস্তু ও উপাদান। আকাশ, বাতাস, পানি, মাটি, চাঁদ, সূর্য, তারা, নদী, পাহাড়, গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি এসব বিষয়বস্তু ও উপাদানের আকার-আকৃতি, গড়ন, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ, ভঙ্গি বিভিন্নভাবে আমাদের আন্দোলিত করে।

‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখাসহ শিল্পকলার যে শাখায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, সে শাখায় ইচ্ছেমতো আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারব এবং শিল্পের আনন্দ উপভোগ করতে শিখব। এর চর্চার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সে নান্দনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গর্ব আর আত্মত্যাগের সকল ইতিহাসকে জেনে অন্তরে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষকে ‘শিল্প ও সংস্কৃতি’ বিষয়টির মধ্যদিয়ে ভালোবাসতে শিখব।

সূচিপত্র

বিশ্বজোড়া পাঠশালা	১—১০
নকশা খুঁজি নকশা বুঝি	১১—১৮
মায়ের মুখের মধুর ভাষা	১৯—২৫
স্বাধীনতা আমার	২৬—৩৪
বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ	৩৫—৪৪
কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি	৪৫—৫৫
প্রাণ-প্রকৃতি	৫৬—৬৪
প্রাণের গান	৬৫—৭২
চিত্রলেখা	৭৩—৭৮
শরৎ উৎসব	৭৯—৮৪
সোনা রোদের হাসি	৮৫—৯০
আমার দেশ আমার বিজয়	৯১—৯৯

বিশ্বজোড়া পাঠশালা

সবার আমি ছাত্র

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে-
দিল-খোলা হই তাই রে।

....

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

(সংক্ষেপিত)

সুনির্মল বসু

ভুবনজোড়া আমাদের এই প্রকৃতির পাঠশালাতে আমরা প্রতিমুহূর্তে কত কিছু দেখছি, জানছি আর শিখছি! উপরের কবিতাটিতে কবি সহজ করে বুঝিয়েছেন প্রকৃতির নানা উপাদান আর বিষয়বস্তু আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী, মাটি, সাগর আমাদের কী শিক্ষা দেয়। এবার নিবিড় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে আমরা শুরু করব আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির পাঠ।

নয়ন মেলে এবার একবার নিজের চারপাশটা দেখি চলো, প্রকৃতির উপাদান আর বিষয়বস্তুর মধ্যে শিল্পীর চোখ দিয়ে খুঁজে দেখি ছবি আঁকার উপাদান। নিজের চারপাশে প্রকৃতির অজস্র উপাদানের মধ্যে যে উপাদানটা আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই তা হলো গাছ। কত রকমের গাছপালায় ভরা আমাদের প্রকৃতি আর কতই না বিচিত্র তাদের ডালপালা আর কাণ্ডের ধরন। এ যেন প্রকৃতি জুড়ে সোজা, বাঁকা, কোনাকুনি রেখার সমারোহ। এবার আর একটু গাছের কাছে গেলে হয়ত বা দেখতে পাব গাছের নিচে ধীর গতিতে হেঁটে চলা শামুক। তার খোলসটা দেখতে আবার প্যাঁচানো রেখার মতো। আকাশের মেঘ, নদীর ঢেউগুলো দেখতে অনেকটা ঢেউ খেলানো রেখার মতো, এইভাবে খুঁজে দেখলে আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে খুঁজে পাব নানা রকমের রেখা।

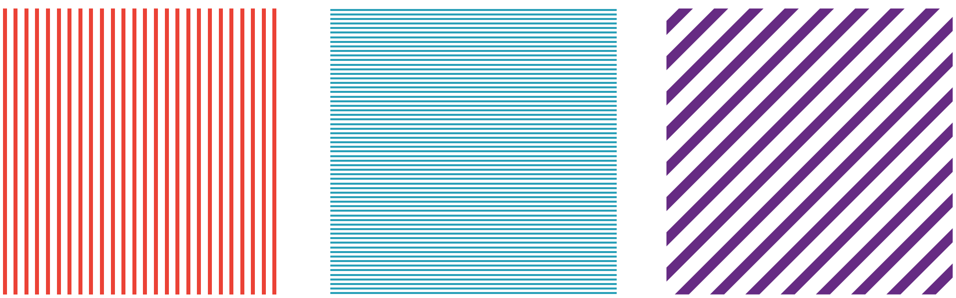

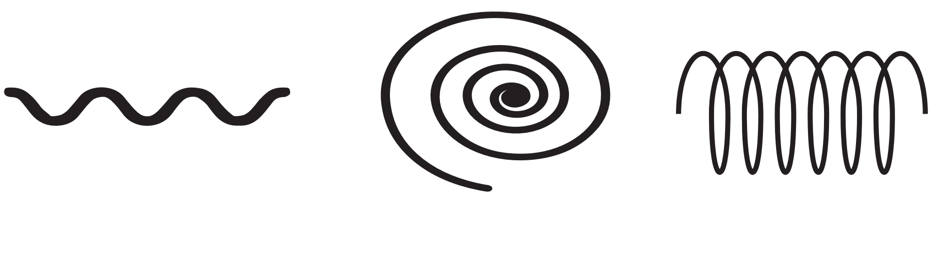

রেখার ঘের দিয়ে তৈরি হয় আকৃতি। যেমন, একটি রেখার এক প্রান্ত যখন অন্য প্রান্তকে স্পর্শ করে তখনই আকৃতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আকৃতি হলো বাইরের রেখা বা সীমারেখায় আবদ্ধ একটি রূপ। ছবিতে আকৃতিগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দ্বিমাত্রিকভাবে আঁকা হয়, কোনো গভীরতা থাকে না। সাধারণভাবে আকৃতি দুই প্রকার, প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক। আকার বলতে বুঝায় কোনো বস্তু কতটা ছোট বা বড় তাকে। তবে সাধারণ ও ব্যবহারিক বাংলায় আকার-আকৃতি শব্দ দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

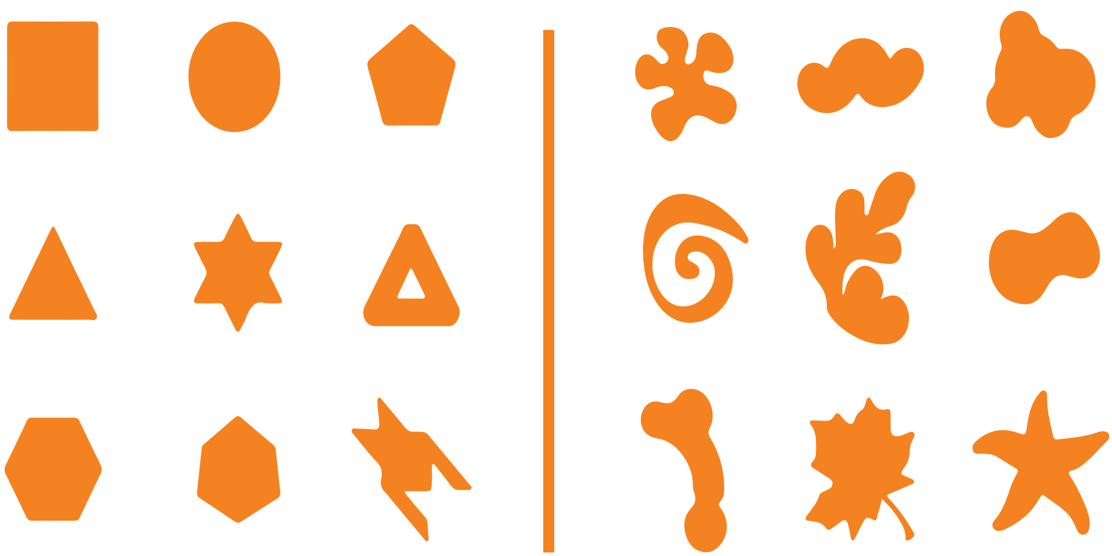

গড়া থেকে গড়ন, গড়ন হলো বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে অর্থাৎ গভীরতার দিকেও বস্তুটির যে দিকগুলো আছে সেগুলোকে মিলিয়ে যখন রূপটিকে আমরা তুলে ধরি তখন সেটা হয় গড়ন। ছবি আঁকার জগতে আকারের মতো গড়নেরও আছে ভিন্নতা, কোনোটা প্রাকৃতিক যেমন—ফুল, পাখি, লতা, পাতা, গাছপালা এইসব আবার কোনোটি জ্যামিতিক যেমন—ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, কোণ, সিলিন্ডার ইত্যাদি।

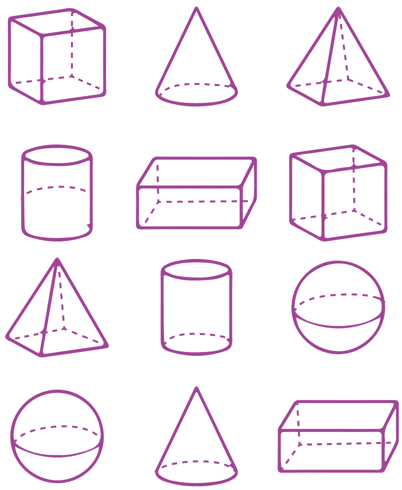

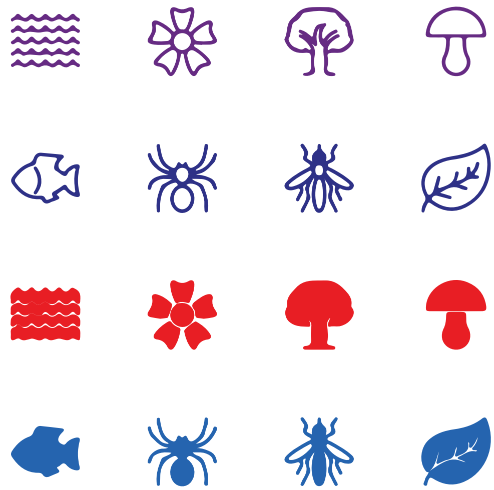

সূর্যের সাত রঙা আলোরা প্রতিনিয়ত রাঙিয়ে দিচ্ছে আমাদের চারপাশকে। সূর্যের সে সাত রঙা আলো নিয়ে আরও অনেক মজার মজার কথা আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে জানতে পারব। কিন্তু এখানে আমরা জানব ছবি আঁকার বর্ণিল জগৎ সম্পর্কে।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতির অজস্র রঙের মধ্য হতে যে রংটি আমরা বেশি দেখতে পাই তা হলো সবুজ। মাঠের ঘাস, গাছের পাতা, কাঁচা ফল, সব মিলিয়ে কতো রকমের সবুজ ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রকৃতিতে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ছবি আঁকার জগতে বর্ণচক্রে প্রাথমিক রংগুলো হলো লাল, নীল, হলুদ। নীল আর হলুদ রং মিলে তৈরি হয় সবুজ, লাল আর হলুদ মিলে হয় কমলা, লাল আর নীলে হয় বেগুনি। সবুজ, কমলা, বেগুনি হলো দ্বিতীয় স্তরের রং। আবার একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রকৃতির সবুজ রঙের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। কোনোটি হলদে সবুজ আবার কোনোটি নীলচে সবুজ; তেমনি কমলা রঙের মধ্যে কোনোটি হলদে কমলা আবার কোনোটি লালচে কমলা, বেগুনি রঙের মধ্যে কোনোটি লালচে বেগুনি আবার কোনোটি নীলচে বেগুনি। রঙের এই পার্থক্যগুলো আমরা তৃতীয় স্তরের বর্ণচক্রে জানতে পারব।

প্রাথমিক বর্ণচক্র

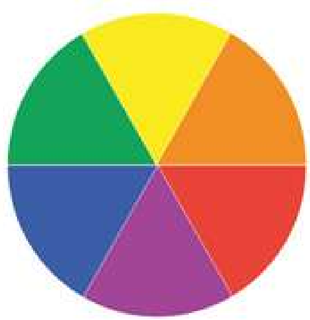

দ্বিতীয় স্তরের বর্ণচক্র

তৃতীয় স্তরের বর্ণচক্র

কোনো বস্তুর যে অংশে আলো পড়ে তার অন্য প্রান্তে তখন ছায়া তৈরি হয়। যেমন আমরা সূর্যের আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে আমাদের বিপরীত পাশটা ছায়ার দিকে থাকে। এইভাবে আলোছায়ার কারণে আমরা বস্তুর গঠন বুঝতে পারি।

আবার আমাদের চারপাশের উপাদানগুলো দেখে, স্পর্শ করে আমরা তাদের ধরন বা বুনট বুঝতে পারি।

রেখা দিয়ে তৈরি আকার-আকৃতির মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলা হয় পরিসর। প্রকৃতির এইসব বিষয়বস্তু আর উপাদান গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আমরা জেনে ফেললাম ছবির উপাদানগুলোকে।

এর মাঝে খেয়াল করেছ বাতাসে গাছটি একদিক থেকে অন্যদিকে দুলছে আর গাছের নিচে ধীরগতিতে চলা প্যাঁচানো খোলসের শামুকটির পাশে দ্রুতগতিতে উড়ে চলছে হরেক রঙের প্রজাপতি। ঠিক তেমনি করে আমরাও যখন কোনো অভিব্যক্তি বুঝাতে হাত, পা অথবা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছন্দময়ভাবে পরিচালনা করি নাচের ভাষায় তাকে বলে চলন।

তেমনি হাতের বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে যখন কোনো অভিব্যাক্তি প্রকাশ করি নাচের জগতে তার নাম মুদ্রা। এর মাঝে আকাশের উজ্জ্বল আলোটা একটু কমে গিয়ে সূর্যটা মেঘের ভিতরে লুকাল। আলোছায়ার ভেতর দিয়ে প্রকৃতি জানাল তার আনন্দ বেদনার গল্প। আর এই রকমের বিভিন্ন মুখভঙ্গির মধ্যদিয়ে অভিব্যক্তির প্রকাশকে নাচের জগতে রস নামে পরিচিত।

এবার প্রকৃতিতে একটু কান পেতে শুনি, বাতাসে দুলে ওঠা গাছটির পাতায় পাতায় ধাক্কা লেগে তৈরি হওয়া শব্দটা শুনতে পাচ্ছি কি? সাথে গাছটির ডালে বসে সুমধুর সুরে ডেকে যাওয়া একটি পাখির ডাক! বাতাসের শব্দ আর পাখির সুমধুর সুরের মধ্য দিয়ে আমরা চলে এলাম সংগীতের জগতে। মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখির কণ্ঠ হতে অথবা পদার্থের আঘাতে যে আওয়াজ বা শব্দ হয় তাকে ধ্বনি বলে। আর গ্রহণযোগ্য শ্রুতিমধুর ধ্বনিকে সংগীতে স্বর বলে। সংগীতের মূল স্বর হলো ৭টি– সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি । একাধিক স্বরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সুর।

একটু খেয়াল করলে এবার আমরা বুঝতে পারব গাছের ডালে বসে গান গাওয়া পাখিটি একটি নির্দিষ্ট তালে সুমধুর স্বরে ডেকে যাচ্ছে যা কখনও দ্রুত আবার কখনও বা ধীরগতিতে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সংগীতের জগতে গতিকে বলে লয় যা–বিলম্বিতলয়, মধ্যলয়, দ্রুতলয় এই তিন নামে পরিচিত। সংগীতে লয়কে মাপা হয় মাত্রা দিয়ে, আর মাত্রার ছন্দবদ্ধ সমষ্টিকে বলা হয় তাল। যেমন–কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি। নিয়মবদ্ধ মাত্রার সমাবেশই ছন্দ। গীত, বাদ্য আর নৃত্য এই তিনকে একসাথে সংগীত বলে।

আপন মনে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান আর বিষয়বস্তু দেখার ভেতর দিয়ে আমরা আঁকা, গড়া, নাচ, গানের উপাদানগুলো সম্পর্কে কত কিছু জেনে ফেললাম। জেনে নেওয়া বিষয়গুলোকে এবার আমরা নিজেদের মতো করে শিল্প সৃষ্টির কাজে লাগাব।

প্রথমে আমরা বর্ণচক্রের রংগুলোর সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন– রংবেরঙের ফুল, পাতা, ইত্যাদি সংগ্রহ করে একটা প্রাকৃতিক বর্ণচক্র বানাব।

প্রাকৃতিক বর্ণচক্র

সে এক মজার খেলা

রঙের সাথে সাথে রং মিলিয়ে চলছে রঙের মেলা

সে এক মজার খেলা

নীল হলুদে সবুজ হবে কালো লালে খয়েরি

সাদা কালো ছাইয়ের মতো রংটি হবে তৈরি

গোলাপি চাও, লালে সাদা মেশাও না এবেলা।

কমলা হবে লাল হলুদে,

বেগুনি লাল নীলে।

ফিকে হবে সব গাঢ় রং

একটু সাদা দিলে

এমনি করে চলছে মধুর রং বানানোর খেলা।

যা করব—

- বর্ণচক্রের রংগুলোর সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন রঙের পাতা সংগ্রহ করব।
- বর্ণচক্রের রংগুলোর সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন রঙের ফুল সংগ্রহ করব।
- গানের সাথে মিলিয়েও বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন—মাটি, ছাই সংগ্রহ করে রং বানানোর চেষ্টা করব।
- খাতায় আঁকা পাতাগুলো রং করার ক্ষেত্রে গাঢ়-হালকা সবুজ রং এর পাশাপাশি অন্য রং মিলিয়ে দেখতে পারি কেমন হয়। যেমন– নীল, হলুদ, লাল ইত্যাদি রং মিশিয়ে দেখতে পারি।
- রঙের গানটি ভালোভাবে অনুশীলন করব।
- আনন্দময় ভঙ্গির মধ্যদিয়ে সবাই মিলে গানটি গাওয়ার চেষ্টা করব।

এইসব কাজ করার জন্য আমাদের একটা খাতা চাই। চলো তাহলে সাদা এবং রঙিন কাগজ দিয়ে খাতাটা বানিয়ে ফেলি। খাতাটার মলাটে নিজের মতো সুন্দর করে নকশা করা চাই কিন্তু। এই খাতায় আমরা বিভিন্ন সময়ে যা কিছু সংগ্রহ করব যেমন পাতা, ফুল, পত্রিকার অংশ ইত্যাদি যা আমাদের পছন্দের তা আঠা দিয়ে লাগিয়ে সংরক্ষণ করব। যা কিছু আঁকা/লেখা তাও কিন্তু করতে হবে এই খাতায়। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়ের কাজ আর চর্চা সম্পর্কেও লিখে রাখব এই খাতায়। খাতাটি হবে আমাদের সবসময়ের সঙ্গী। যা হবে আমাদের বন্ধুখাতা।

এই অধ্যায়ে আমি যা যা করেছি তা লিখি এবং আমার অনুভূতি বর্ণনা করি–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নকশা খুঁজি নকশা বুঝি

বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লী মায়ের কোল,
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল
কুলের কাঁটার আঘাত লইয়া কাঁচা পাকা কুল খেয়ে,
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছে গাঁয়ের দুলালি মেয়ে
পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশীতে বিষম খেয়ে,
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি খেয়ে।

– সুফিয়া কামাল

বারো মাসে তের পার্বণের দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এইসব পার্বণ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শেকড়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কৃতির মতো এদেশেও শিল্প একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে আমাদের রোজকার জীবনে। রান্নাঘরের পাটাপুতার (শিলনোড়া) নকশা থেকে গায়ে দেওয়ার কাঁথায়ও কতো রকমের নকশা। খেয়াল করে কখনও দেখা হয় না আমাদের খুব একটা। তারপরও কিছু কিছু নকশা এমন সুন্দর হয় যে খেয়াল না করে উপায় থাকে না।

নকশিপিঠা তেমনি সুন্দর একটা শিল্প। যুগে যুগে উৎসব অনুষ্ঠানের একটা প্রধান আকর্ষণ পিঠা আর সে পিঠা দেখতে গিয়ে যদি খাওয়ার কথা মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলে যায় তবে সে নিশ্চিত একটা দারুণ বিষয়। নকশি পিঠার কথাই বলছি। কিছু ঘরোয়া টুকিটাকি যেমন চুলের কাঁটা বা খেজুর কাঁটা, সুঁচ, কাঠি, কাঁটাচামচ বা আনকোরা নতুন চিরুনি, এককথায় যা কিছু দিয়ে নকশা ফোটানো যায় তার সবই ব্যবহার হয় নকশা করার জন্য। যেন আমাদের চেনা পরিবেশ থেকে পরিচিত সব ফল, ফুল, মাছ, গাছ, লতাপাতা সেসব নকশায় উঠে আসে রূপকথার রূপ নিয়ে নকশিপিঠার নকশায়। এসব নকশা শিশুকাল থেকেই মনে আগ্রহ জন্ম দেয়, সুন্দরকে দেখার আর সেটা চর্চায় আনার প্রথম পাঠ আমাদের নিতান্ত সহজ সাধারণ পিঠা-পার্বণের হাত ধরে।

পিঠার নকশাতো হলো এবার বলি রিকশার কথা। এ যেন এক বর্ণিল নকশার জগৎ। আমাদের দেশে রিকশার গায়ে পেইন্টিং, হুডে নকশা—সব মিলিয়ে প্রতিটি রিকশা যেন এক একটা চলমান শিল্প। রিকশা শিল্পীদের দীর্ঘদিনের চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশের রিকশাশিল্প আজ একটি জনপ্রিয় শিল্পধারা হিসেবে দেশের বাইরেও সমাদৃত হচ্ছে।

পোশাকে, চাদরে, বিভিন্ন আসবাবপত্রের গায়ে, চায়ের কাপে, খাবারের থালায়, জানালার গ্রিলে, ঘরের মেঝেতে, প্রসাধনীর প্যাকেট, ঘড়ি থেকে মোবাইল ফোন– সর্বত্রই আমরা নকশা দেখতে পাই।

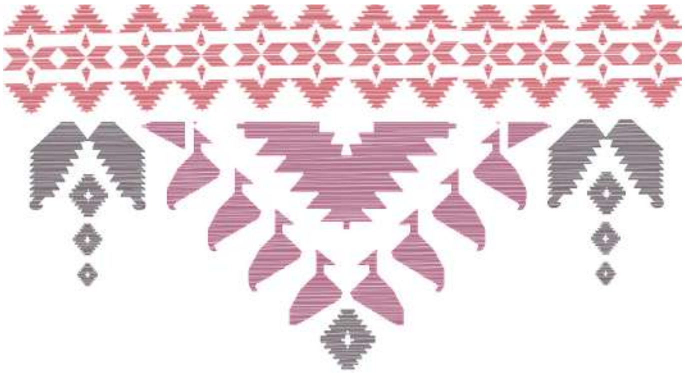

ছবিতে যদি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব নানা রকমের রেখা ও আকার-আকৃতিকে একই রকম করে পুনরাবৃত্তিকভাবে (repetitive) সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে নকশাগুলো। বিভিন্ন রেখা পাশাপাশি রেখে প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকার-আকৃতি দিয়েও সৃষ্টি করা যায় নানা রকমের নকশা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা ছবি আঁকার উপাদান রেখা, আকার-আকৃতি, গড়ন সম্পর্কে জেনেছিলাম। সোজা, বাঁকা, মোটা, চিকন, খাড়া, শোয়ানো, কোনাকুনি নানা রকমের রেখা দিয়ে সৃষ্টি করা যায় অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। এই অভিজ্ঞতায় আমরা নিজেদের আশপাশ থেকে বিভিন্ন রকমের রেখার মাধ্যমে তৈরি নকশা খুঁজে বের করব এবং তা আমাদের বন্ধু খাতায় লিখে/এঁকে রাখব; যা আমরা নকশা তৈরিতে ব্যবহার করব। প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকার ও আকৃতি দিয়ে নকশা ও বিভিন্ন শিল্প তৈরির বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে আরও জানব।

এই পাঠে প্রথমে আমরা জানব কীভাবে সহজে নকশা তৈরি করা যায়।

নকশা: পরিকল্পনা অনুসারে রেখা বা আকার-আকৃতিকে একই রকম করে পুনরাবৃত্তিকভাবে (repetitive) সাজানোর মধ্যদিয়ে আমরা সহজে নকশা তৈরি করতে পারি। নকশা তৈরি আরও কিছু নিয়ম-রীতি আছে যা আমরা পরবর্তীতে জানব।

এবার আমরা বিভিন্ন রকমের রেখা দিয়ে নকশা তৈরি করব, এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সংগৃহীত নকশার নমুনা থেকেও সাহায্য নিতে পারি।

- প্রথমে আমরা ন্যূনতম দৈর্ঘ্যে ছয় ইঞ্চি, প্রস্থে চার ইঞ্চি একটা আয়তক্ষেত্র আঁকব।
- আয়তক্ষেত্রটাকে ১ ইঞ্চি করে করে ভাগ করে নেব। যার ফলে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্যে আমরা ৬টি ১ ইঞ্চি মাপের আর প্রস্থে ৪টি ১ ইঞ্চি মাপের ছক পাব। প্রত্যেকটা সারিকে ১, ২, ৩, এইভাবে নম্বর দিয়ে রাখতে পারি।
- ১ নম্বর সারির প্রথম ঘরে আমরা ২টি সোজা রেখা পাশাপাশি আঁকব।
- ২ নম্বর সারির প্রথম ঘরে আমরা ২টি সোজা রেখা খাড়াভাবে আঁকব।
- এইভাবে ৬ নম্বর সারি পর্যন্ত ২৪ ঘর পূরণ করে আমরা একটা সহজ নকশার প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি।

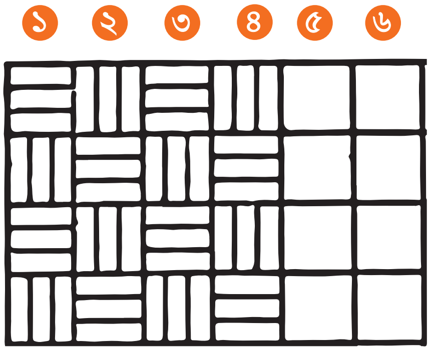

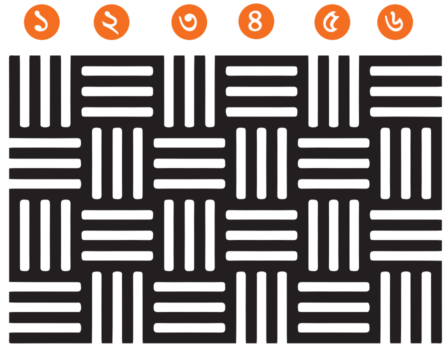

একইভাবে সোজা রেখাকে কোনাকুনিভাবে সাজিয়ে সারির সংখ্যা বাড়িয়ে-কমিয়েও আমরা নকশার প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি।

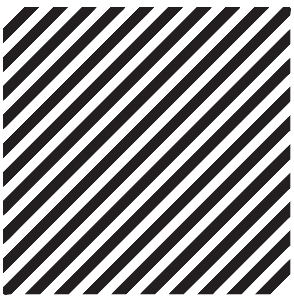

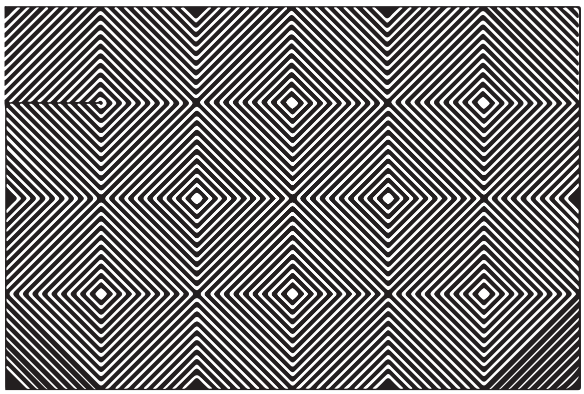

সোজা রেখার জায়গায় আমরা বক্ররেখার পাশাপাশি এবং খাড়াভাবে এঁকেও নকশার প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি। তাছাড়া একাধিক প্যাটার্নকে একত্রিত করেও আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের নকশা তৈরি করতে পারি।

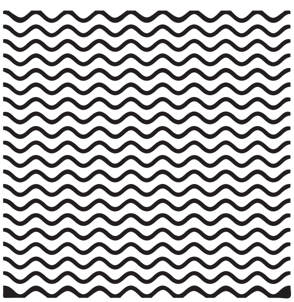

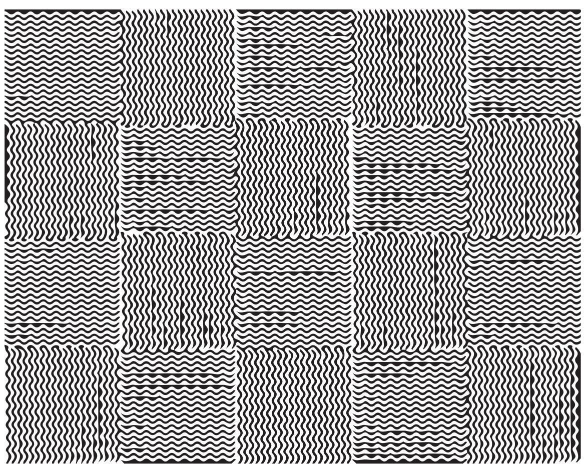

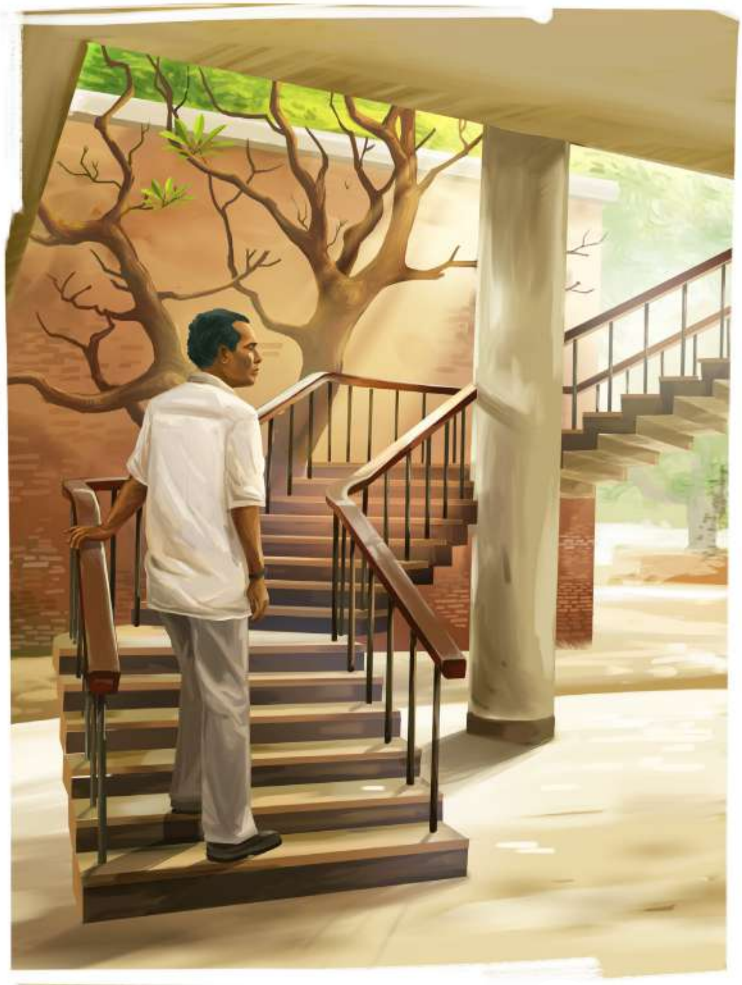

জয়নুল আবেদিন

এবার আমরা জানব এমন একজন বিখ্যাত শিল্পীর কথা যিনি ছবি আঁকার অন্যান্য মাধ্যম যেমন—জলরং, তেলরঙের সাথে সাথে শুধু কালি দিয়ে রেখার আঁচড়ে সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী সব শিল্পকর্ম। তিনি হলেন আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। আমরা এবার জেনে নেই, তাঁকে কেন শিল্পাচার্য বলা হয়। জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেটি শুরু হয়েছিল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনের মাধ্যমে। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমীন, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পী। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তাঁর শৈল্পিক দূরদর্শিতায় ও নেতৃত্বে আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এই জন্য তাঁকে 'শিল্পাচার্য' উপাধি দেওয়া হয়।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর কিছু শিল্পকর্ম

দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩, কালি ও তুলি

দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩, কালি ও তুলি

বিদ্রোহী, ১৯৫১

আমাদের লোকশিল্পের প্রতি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছিল অসীম ভালোবাসা। লোকশিল্প ধারাগুলোকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় লোকশিল্প জাদুঘর।

লোকশিল্প জাদুঘর

যা করব—

- আশপাশে দেখা/জানা লোকশিল্পের তালিকা বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- আশপাশে পুনরাবৃত্তিকভাবে অবস্থান করে নকশা তৈরি করছে/হচ্ছে তার layout/খসড়া বন্ধুখাতায় এঁকে রাখব।
- রেখাভিত্তিক এবং আকৃতিভিত্তিক নকশা খুঁজে পেলে তা আলাদা করে রাখব।
- কাগজ/মাটি দিয়ে repetitive pattern তৈরি করতে পারি।
- কাগজ কেটে ঝালর তৈরি করতে পারি।
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করব।

নকশা আঁকব—

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মায়ের মুখের মধুর ভাষা

ঢাকা – আপনে কিমুন আচেন?

চট্টগ্রাম – অনে ক্যান আছন?

খুলনা – আপনি কিরাম আছেন?

রাজশাহী – কেমন আছেন গো?

বরিশাল – এই তুমি আছো কেমন?

সিলেট – আফনে কিলা আছইন?

রংপুর – তোমরা কেমন আছেন বাহে?

ময়মনসিংহ – আফনে কিবুম আছুইন?

মায়ের মুখের মধুর ভাষা

সচরাচর আমরা আমাদের বাবা মায়ের সাথেই থাকি। আমাদের বাবা মায়েরা অনেক সময় তাদের কর্মস্থলের কারণে নিজ গ্রাম বা জেলা ছেড়ে অন্য শহর অথবা জেলায় আমাদের নিয়ে বসবাস করেন। তবে আমরা সবাই কোনো না কোনো অঞ্চলে বসবাস করি। আমরা বিভিন্ন ছুটিতে কিংবা উৎসবে দাদাবাড়ি/নানাবাড়ি/অন্য কোথাও বেড়াতে যাই। সেখানে থাকা আমাদের আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও স্থানীয় লোকজন বেশিরভাগ বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন, তবে সে ভাষার বেশ কিছু শব্দ ও কথা বলার ধরন অনেকটাই আলাদা।

আবার আমাদের ক্লাসে আমরা অনেক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করি। সেখানে একেকজন একেক জেলা বা অঞ্চল থেকে এসে একই ক্লাসে পড়ছি। এই একই ক্লাসে আমরা অনেকেই বইয়ের ভাষার বাইরেও একটু আধটু নিজ জেলার ভাষায় কথা বলি। আর এই ভাষাটিই হলো আঞ্চলিক ভাষা। যাকে আবার উপভাষাও বলা হয়। আমরা জানি যে আমাদের দেশে বাঙালিসহ আরও অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে, সেই সমস্ত নৃগোষ্ঠীর আছে নিজস্ব ভাষা। যেমন চাকমা ভাষা, মারমা ভাষা, গারো ভাষা, ম্রো ভাষা ইত্যাদি। কোনো কোনো উপভাষার আছে নিজস্ব বর্ণমালা। ভাষা হলো সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ।

আমরা বেশির ভাগ মানুষই সর্ব প্রথম এই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি। কারণ ঐটিই আমাদের মায়ের মুখে শোনা প্রথম বুলি। আমাদের প্রথম ভাবের আদান-প্রদান এই ভাষাতেই। তাই এই ভাষাকে আমরা মায়ের ভাষা বলি। হয়তো এই কারণেই এই আঞ্চলিক ভাষা আমাদের কাছে এতোই মধুর। আমরা অনেকেই ঘরের বাইরে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বললেও নিজের ঘরে, নিজেদের আত্মীয়দের সাথে এই ভাষাতেই কথা বলি। আঞ্চলিকতার মাঝে বেড়ে ওঠা আমরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেই প্রশান্তি অনুভব করি।

এবার চলো, আমরা জেনে নেই আমাদের শ্রেণিতে কে কোন জেলা থেকে এসেছে এবং কোন জায়গার ভাষা কেমন। নিজেরা যদি নিজের আঞ্চলিক ভাষা না জানি তাহলে তা আমরা মা-বাবা, দাদা-দাদির কাছ থেকে জেনে নেব। যত রকমের আঞ্চলিক ভাষা আমরা পেলাম তা বন্ধুখাতায় লিখে রাখতে যেন ভুল না হয়।

আমরা কি জানি, আমাদের বাংলা বর্ণমালা লেখার জন্য রয়েছে নানা রকমের বাংলা লিপি বা ফন্ট (font) আবার তাদেরও রয়েছে হরেক রকমের নাম। হাতে লেখার যুগ থেকে শুরু করে কম্পিউটারের এই যুগ পর্যন্ত বাংলা লিপি বা ফন্টের (font) রয়েছে বিশাল জগৎ, তার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনাতার সংগ্রামসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পোস্টার, দেয়ালিকা লিখতে গিয়ে কত রকমের বাংলা লিপির সৃষ্টি তা এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না। এ যেন শিল্পের আরেক সাম্রাজ্য। বাংলা লিপি বা ফন্ট (font) বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমরা পরে আরও বিস্তারিত জানব।

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

চলো এবার আমরা নিজের মতো করে সহজে কীভাবে বাংলা বর্ণমালা লেখা যায় তা অনুশীলন করি। সাথে সাথে আমাদের মধ্যে যার যার মাতৃভাষার বর্ণমালা আছে তারা তা লেখার জন্য অনুসন্ধান করি।

ছবির মতো করে লেখা তো শেখা হলো, এবার বাংলা অথবা নিজ নিজ মাতৃভাষায় আমরা 'মায়ের মুখের মধুর ভাষা' বাক্যটি দিয়ে নিজস্ব ডিজাইনে একটি পোস্টার তৈরি করব। এই পোস্টারগুলো আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রদর্শন করব।

'মায়ের মুখের মধুর ভাষা'

ভাষা মুখ থেকে কলমে আসে, মানে হলো ভাষা মুখে মুখেই প্রচলিত হয় বেশি পরে তা লেখা হয়। সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এই ভাষার সৃষ্টি। তাই একেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা একেক ধরনের হয়ে থাকে।

লোকসংগীত, লোকসাহিত্য, লোকনাট্য, লোককাহিনী, লোকগাথা, ছড়া, প্রবাদ–প্রবচন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে এই আঞ্চলিক ভাষার উপর নির্ভর করে। বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা লোকসংগীতের একটি জনপ্রিয় ধারা হলো কবিগান।

কবিগান যারা করেন তারা হন একাধারে কবি ও গায়ক। তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে সেটা গেয়ে প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়াটা কবিগানের প্রধান ধরন। বাংলার কবিগানের জগতে রমেশ শীল একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। আমরা এবার কবিয়াল রমেশ শীল সম্পর্কে জানব।

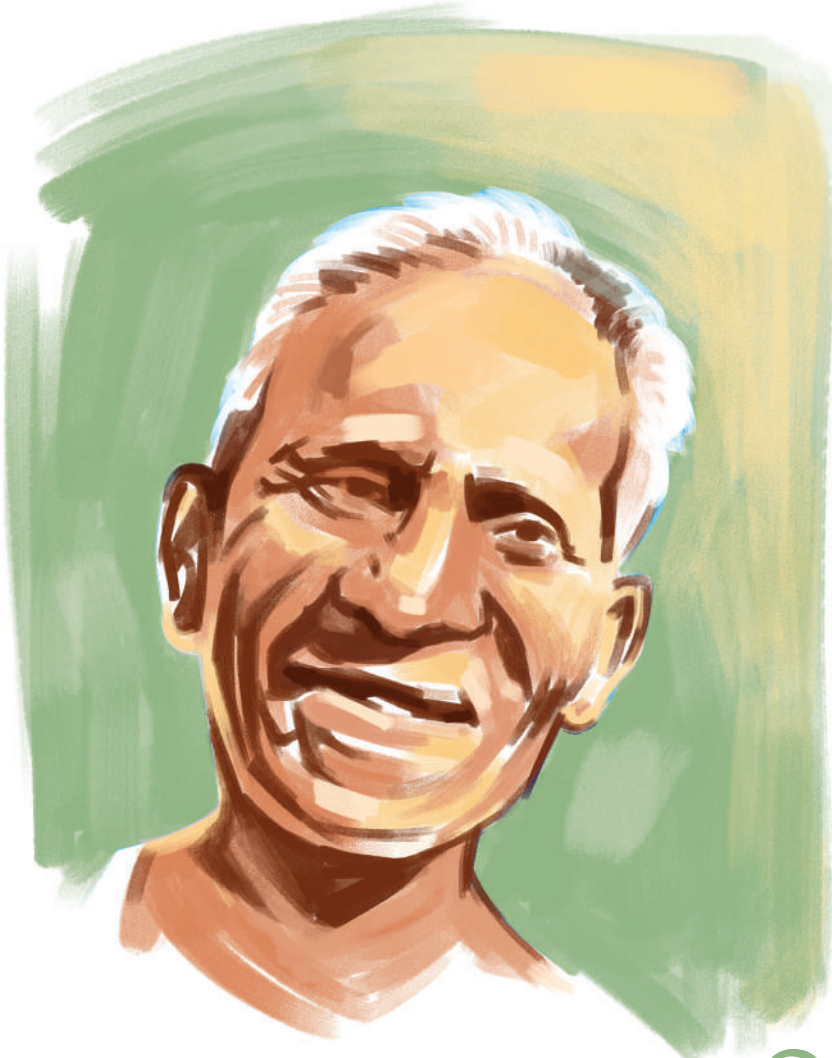

রমেশ শীল

রমেশ শীলের জন্ম চট্টগ্রাম জেলার গোমদণ্ডী গ্রামে ১৮৭৭ সালে। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। তিনি এই শিল্পের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করেছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে সাধারণত কবিগানের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কবিগান ঐতিহ্যগতভাবে পৌরাণিক এবং অন্যান্য লোককথা থেকে এর বিষয়বস্তু নির্বাচন করত। জনপ্রিয় বিষয় ছিল – রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ, হানিফা-সোনাবানু ইত্যাদি। রমেশ শীলকে যা আলাদা করে তা হলো যে তিনি এই ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বিষয় বেছে নিয়েছিলেন,যেমন– সত্য-মিথ্যা, গুরু-শিষ্য, পুরুষ-নারী, ধনী-গরিব, ধন-জ্ঞান।

সময়ের সাথে সাথে তাঁর গান আরও বেশি সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে। তখনকার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল সম্পদ-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-শান্তি, কৃষক-জমিদার, স্বৈরাচার-গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ-সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। কবিগানের ২০০ বছরের পুরনো ইতিহাসে এটি ছিল একটি মৌলিক পরিবর্তন।

কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা ছাড়াই, কবিয়াল রমেশ শীল তাঁর মহাকাব্য 'জাতীয় আন্দোলন' এর মতো অসাধারণ রচনাগুলো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনসহ নানা আন্দোলন সংগ্রাম নিয়ে গান রচনা করার ফলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি কবিগানকে সামাজিক সচেতনতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

রমেশ শীলের আরেকটি বড় অবদান হলো মাইজভাণ্ডারি গান রচনা। তাঁর রচিত মাইজভাণ্ডারি গান আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। তাঁর রচিত মাইজভান্ডারী গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ। যা আশেকেমালা, শান্তিভাণ্ডার, মুক্তির দরবার, নূরে দুনিয়া, জীবনসাথী, সত্যদর্পণ, ভাণ্ডার মওলা, মানববন্ধু, এশকে সিরাজিয়া এই নয়টি বইয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত

'ইসকুল খুইলাসে রে মওলা, ইস্কুল খুইলাসে'

গানটি মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠ একটি জনপ্রিয় গান। তাঁর রচিত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার গান আমাদের লোকসংগীতের অনন্য সম্পদ।

যা করব—

- নিয়ম মেনে বিভিন্ন বাংলা font লিখে রাখব বন্ধুখাতায়।
- নিজের ভাষায় পছন্দমতো font-এ 'মায়ের মুখের মধুর ভাষা' লেখা পোস্টার বানাব। পোস্টারটি ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করব।
- এইবার নিজ এলাকার যেকোনো সহজ, বয়সোপযোগী একটি আঞ্চলিক গান বাছাই করব (স্থানীয়)।
- একটি দল উক্ত গানটিকে সমবেতভাবে গাওয়ার চেষ্টা করব।
- আরেকটি দল সে গানটিকে ভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করব। এইক্ষেত্রে আমরা আগে দেখব আমাদের অঞ্চলে স্থানীয় কোনো লোকজ নৃত্যধারা আছে কিনা। থাকলে সেই নৃত্যভঙ্গিগুলো এই গানটির সাথে বা তালে তালে চর্চা করব।
- চাইলে আমরা একটি দল সেই গানটির বিষয় বুঝে ছোট একটি নাটিকাও করে ফেলতে পারি।
- আমরা কবি রমেশ শীলের শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করব।

মায়ের মুখে মধুর ভাষা বলতে আমি যা বুঝি তা লিখি–

স্বাধীনতা আমার

স্বাধীনতা শব্দটির মানে মনে মনে আমরা সবাই জানি। না জানলেও কেমন করে যেন বুঝে ফেলি। শব্দটা একটা দেশের জন্য, সে দেশের মানুষের জন্য খুব জরুরি আর প্রিয় একটা শব্দ। আমাদের দেশটা আমাদেরই ভূখণ্ড আর কারোর নয়, আর আমরা আমাদের দেশেরই নাগরিক। কিন্তু এমনটা সবসময় ছিল না। স্বাধীনতাকে পেতে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে টানা নয় মাস।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণে সারা বাংলার মানুষ একসাথে কেবল একটাই স্বপ্ন দেখা শুরু করল, সেই স্বপ্নের নাম ‘স্বাধীনতা’ আর ‘মুক্তি’।

স্বপ্ন সবাই চোখ বুজেই দেখে কিন্তু যে স্বপ্ন মানুষ খোলা চোখে দেখে সেই স্বপ্নের বীজ বোনা থাকে মনে। দিনে দিনে তাকে সত্য করতে যা কিছু করার মানুষ তার সবকিছুই করে। যারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নের জন্য যুদ্ধ করেছেন, শহিদ হয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক কিশোর মুক্তিযোদ্ধাও ছিল। আমরা আমাদের বাংলা বই থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারব। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানাতে চলো আমরা এবার একটা কাজ করি। সে কাজটির নাম দিলাম **চলো নকশা হই**।

কাগজে কলমে নকশা আঁকা আমরা শিখলাম। এবার আমরা নিজেদের শরীর ব্যবহার করে নানারকম নকশা তৈরির চেষ্টা করতে পারি। জাতীয় দিবসসহ নানা রকম অনুষ্ঠানে আমরা মানব শরীরকে ব্যবহার করে নানা ধরনের নকশা উপযোগী ডিসপ্লে (display) দেখতে পাই।

চলো নকশা হই–

- শরীর দিয়ে নকশা তৈরির জন্য আমরা প্রথমে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব।
- বিভিন্ন রকম নকশা দেখে, একেকটি দল একেকটি নকশা নির্বাচন করব। যেমন– ত্রিভুজ , বৃত্ত, ঢেউ, শাপলা ফুল, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি।

- মাটিতে বেশ বড় করে সে নকশাটি এঁকে নেব। সেটা চক কিংবা কাঠি বা ইটের টুকরা, মাটির পাত্রের ভাঙা অংশ দিয়ে এঁকে নিতে পারি।
- এবার সে নকশা অনুযায়ী সবাই দাঁড়াব। এভাবে আমরা নকশা বানানোর অনুশীলন করব শরীর দিয়ে। সেটা আমরা নকশার উপরে দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে পড়েও করতে পারি।
- চূড়ান্তভাবে আমরা এটি তৈরি করব কোনো রকমের নকশা না এঁকে শুধু নিজেদের শরীরগুলোকে ব্যবহার করে।
- চূড়ান্ত প্রদর্শনের সময় আমরা নির্বাচিত স্থানে (যেখানে চূড়ান্ত প্রদর্শনী হবে) একেকটি দল একটা নকশা হব, কিছুক্ষণ থেকে বের হয়ে যাব, আবার আরেকটি দল আসবে তারাও অন্য একটি নকশা প্রদর্শন করবে। এভাবে প্রতিটি দল তাদের নকশা উপস্থাপন করবে।
- নকশা প্রদর্শনের সময় আমরা হাতে তালি দিয়ে ১, ২, ৩ গুনে একটি তাল তৈরি করে তার সাথে নিচের স্বরগুলোকে পুনরাবৃত্তিকভাবে গেয়ে ও বাজিয়ে তা ডিসপ্লে করতে পারি।

সা রে গা, রে গা মা, গা মা পা

মা পা ধা, পা ধা নি, ধা নি র্সা

র্সা নি ধা, নি ধা পা, ধা পা মা

পা মা গা, মা গা রে, গা রে সা

তাছাড়া স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের ভাবনাকে আমরা ছবি এঁকে অথবা সৃজনশীল লেখার মাধ্যমেও প্রকাশ করতে পারি, **চলো নকশা হই** প্রদর্শনীর দিন আমরা আমাদের আঁকা ছবিগুলো প্রদর্শন করব।

দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দিয়ে গেছে প্রিয় স্বাধীনতা। সে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নকে বাস্তব করতে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে দেশের জন্য।

চলো, একটা গানের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতাতে বুঝি। গানটির গীতিকার ও সুরকার শ্রদ্ধেয় খান আতাউর রহমান।

হায় রে আমার মনমাতানো দেশ

হায় রে আমার সোনা ফলা মাটি

রূপ দেখে তোর কেন আমার পরান ভরে না।

তোরে এত ভালবাসি তবু পরান ভরে না

যখন তোর ওই গাঁয়ের ধারে

ঘুঘু ডাকা নিঝুম কোনো দুপুরে

হংসমিথুন ভেসে বেড়ায়

শাপলা ফোটা টলটলে কোন পুকুরে

নয়ন পাখি দিশা হারায়

প্রজাপতির পাখায় পাখায়

অবাক চোখের পলক পড়ে না।

যখন তোর ওই আকাশ নীলে

পাল তুলে যায় সাত সাগরের পশরা

নদীর বুকে হাতছানি দেয়

লক্ষ ঢেউয়ের মানিক জ্বলা ইশারা

হায়রে আমার বুকের মাঝে

হাজার তারের বীণা বাজে

কাজের কথা মনে ধরে না।

সারা দেশ যখন মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, শিল্পীসমাজ এ যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাদের রংতুলিই তখন হাতিয়ার। মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই তখন তাঁদের কর্তব্য।

মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে ও বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করাই তখন শিল্পীদের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে।

কামরুল হাসান

শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু, শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, শিল্পী নাসির বিশ্বাস, শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল ও শিল্পী বীরেন সোম কাজ শুরু করেন।

শিল্পী কামরুল হাসান মূলত দুটি পোস্টার করেছিলেন। একটি ছিল রক্তচোষা মুখমণ্ডল, হাঁ-করা মুখে দুই দিকে দুটো দানবিক দাঁতে লাল রক্ত ঝরছে। বড় দুটো চোখ আর খাড়া বড় কান, দেখলেই মনে হয় রক্তপায়ী এক দানব।

আরেকটি পোস্টারে ছিল সম্মুখ দিকে তাকানো বড় বড় রক্তচক্ষু, কান দুটো হাতির কানের মতো খাড়া। মুখ কিছুটা বন্ধ। ঠোঁটের দুই দিকে খোলা, দুই দিকে চারটি দাঁত বের করা। দেখেই মনে হয়, দানবরূপী ইয়াহিয়া খানের মুখাবয়ব। পোস্টারটির ভেতর শিল্পীর রূপকল্পনার গভীরতা ছিল, কলম ও তুলির দক্ষ আঁচড় ছিল আর সবচেয়ে মারাত্মকভাবে যা ছিল, তা হলো শত্রুর প্রতি গভীরতম ঘৃণা। এই ঘৃণাই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার ভেতর সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

এ পোস্টার দুটোর একটি দুই রঙে ও অন্যটি একরঙে করা হয়। দুটো পোস্টারই ছাপিয়ে মুক্তাঞ্চলে বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে যেমন তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

পোস্টারটি পৃথিবীর বহু দেশে পাঠানো হয়েছিল। দেশে-বিদেশে পোস্টার দুটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের এটি যে কত বড় মারণাস্ত্র হয়ে শত্রুকে আঘাত করেছিল, সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এযাবৎকাল যুদ্ধের যত পোস্টার হয়েছে, এতটা ঘৃণা সঞ্চারকারী এবং ক্রোধ উদ্রেককারী দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। মুক্তিযুদ্ধকালে আরও পোস্টার হয়েছিল। সেগুলো হলো: 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রীষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি', 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালির জীবন', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব'—এ রকম অসংখ্য পোস্টার ও লিফলেট আমাদের প্রথম সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পীদের আঁকা পোস্টার দেখে দর্শক ও মুক্তিযোদ্ধাদের মন আবেগে আপ্লুত হয়েছিল।

প্রথম মানচিত্রখচিত পতাকার নকশাটি করেন শিবনারায়ণ দাস। ১৯৭০ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের কক্ষে তৎকালীন ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে নানা আলোচনার পর পতাকার নকশা ও পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নকশাকার শিল্পী কামরুল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত। সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক, বৃত্তের লাল রং উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এই রূপটি প্রদান করেন শিল্পী কামরুল হাসান যা ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়।

আমাদের পতাকা আমাদের সাহস জোগায় দেশের জন্য লড়তে। দেশকে ভালোবাসতে।
শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে স্বাধীন দেশের জাতীয় প্রতীকের নকশা হয়। মোহাম্মদ ইদ্রিসের আঁকা ভাসমান শাপলা ও শামসুল আলমের দুই পাশে ধানের শিষবেষ্টিত পাটপাতা ও চারটি তারকা অংশটি মিলিয়ে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের কেন্দ্রে রয়েছে পানিতে ভাসমান একটি শাপলা ফুল যা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। শাপলা ফুলটিকে বেষ্টন করে আছে ধানের দুটি শিষ। চূড়ায় পাটগাছের পরস্পরযুক্ত তিনটি পাতা এবং পাতার উভয় পার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি তারকা। পানি, ধান ও পাট প্রতীকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি। এ তিনটি উপাদানের উপর স্থাপিত জলজ প্রস্ফুটিত শাপলা হলো অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতীক। তারকাগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে জাতির লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

শিল্পী কামরুল হাসানকে পটুয়া কামরুল হাসান নামেও ডাকা হয়। কেন ডাকা হয় তা আমাদের জানা আছে কি? বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি জনপ্রিয় ধারা হলো পটচিত্র আর শিল্পী কামরুল হাসান এই ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ছবি আঁকেন তাই তাঁকে পটুয়া নামে ডাকা হয়।

শিল্পী কামরুল হাসান এর কিছু শিল্পকর্ম

বাংলাদেশ সরকারের ডাক বিভাগ কামরুল হাসানের ‘নাইওর’ নামের এই শিল্পকর্ম দিয়ে ১৯৮৬ সালে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

বক, ১৯৭৪

তিন কন্যা, তেলরং, ১৯৮৩

যা করব—

- নিজেদের শরীরকে ব্যবহার করে নকশা তৈরি করব।
- হাতে তাল দিয়ে স্বরগুলো অনুশীলন করব।
- স্বাধীনতার পোস্টার কেমন লাগল তা নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করব।
- স্বাধীনতা বিষয়ে নিজের মতামত /অনুভূতি বন্ধুখাতায় লিখব।
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী সৃজনশীল লেখার বিষয়ে ধারণা নিয়ে গল্প/কবিতা/রচনা লিখব ।
- ছবি আঁকার মধ্যদিয়ে নিজের স্বাধীন অনুভূতি প্রকাশ করব।
- শিল্পী কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করব।

স্বাধীনতা বলতে আমি যা বুঝি তা লিখি–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বৈচিত্র্য ভরা বৈশাখ

বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ

সময়ের আবর্তনে বছর ঘুরে আসে বাংলা নতুন বছর। এই নতুন বছরকে ঘিরে থাকে কতই না আয়োজন! শহর কিংবা গ্রাম সকল জায়গায় সবাই মেতে ওঠে বর্ষবরণ উৎসবে, আয়োজন করা হয় বৈশাখি মেলা। মেলাকে ঘিরে বসে আঞ্চলিক ও লোকগানের আসর, যাত্রাপালা, পুতুল নাচ। মেলায় আসে রংবেরঙের নকশা করা কত জিনিস আর নানা রকম খেলনা। মেলায় একটি বিশেষ আকর্ষণ হলো নাগরদোলা। মেলায় পাওয়া যায় মুখরোচক অনেক খাবার যেমন– মুড়ি-মুড়কি, খাজা-গজা, চিনির তৈরি হাতি, ঘোড়া, মাছ, পাখি আকৃতির নানা রকমের মিষ্টি। বৈশাখি উৎসব উদ্‌যাপনের জায়গাটিকে সাজানো হয় বিভিন্ন রঙিন দেশীয় জিনিস দিয়ে যেমন—কুলা, ডালা, মুখোশ, কাগজের ফুল, নানান রকম নকশা ও আলপনা করে। পরিবেশন করা হয় গান, নাচ, আবৃত্তিসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বর্ষবরণ নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চমৎকার গানটি দেওয়া হলো। পুরনো দুঃখ-বেদনাকে পেছনে ফেলে নতুনকে বরণ করার, নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার আহবান রয়েছে গানটিতে।

এসো হে বৈশাখ এসো এসো,
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক এসো এসো।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক যাক যাক।।

বৈসাবি, বিজু, বৈসু সাংগ্রাইন, চাঃক্রান পই প্রভৃতি উৎসবের মধ্যদিয়ে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উদ্‌যাপন করে থাকে।

আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি জুড়ে আলপনার রয়েছে বিশাল কদর। চালের গুড়াকে পানির সাথে মিশিয়ে বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষ্যে আলপনা আঁকার প্রচলন আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের। তাছাড়া শখের হাঁড়ি, মাটির খেলনাসহ বিভিন্ন লোকসামগ্রীতে লোকশিল্পীদের সহজ সরল সাবলীল আলপনা আঁকার প্রচলন দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের ফুল, লতা, পাতা, মাছ, পাখি হলো এই সব আলপনার মূল বিষয়বস্তু। তাছাড়া নানা রকমের ফোঁটা আর রেখার ব্যবহার ও দেখা যায় সেসব আলপনায়।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই লোকশিল্পরীতি ক্রমশ হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সবত্রই লক্ষ করা যায় আলপনার বহুল ব্যবহার। “এবার চল আমরা আমাদের আশেপাশের আলপনা খুঁজে দেখি”।

আগের পাঠে আমরা বিভিন্ন রেখার সাহায্যে নকশা তৈরি করা শিখেছিলাম। এবার আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক আকার যেমন–ফুল, লতা, পাতা, মাছ, পাখি এবং নানা রকম জ্যামাতিক আকার যেমন– ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি দিয়ে কি করে আলপনা আঁকা যায় তা জানব।

বর্ষবরণে ব্যবহার করা নানা জিনিসে বা ক্ষেত্রে যে আলপনা ও নকশা খুঁজে পেলাম তাকে আগের পাঠে দেখে আসা নকশার সাথে মিলিয়ে দেখি। কাজটি জোড়ায়/দলে করতে পারি। নিজেদের দেখা আলপনাগুলো আমরা খসড়া আকারে এঁকে এবং তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে রাখব। এবার খসড়াগুলো মিলিয়ে নিজের মতো করে একটি আলপনা বা নকশা আঁকার পালা। আলপনা বা নকশা আঁকার জন্য আমরা হাতের কাছে পাওয়া উপকরণকে প্রাধান্য দেবো। তাছাড়া বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে ঝালর বানিয়েও আমরা নানা রকমের নকশা তৈরি করতে পারি।

আলপনা আর নকশা সৃষ্টি করতে করতে এবার আমরা জানব বাংলার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের কথা। আর তা হলো পুতুলনাচ। বিভিন্ন ধরনের পুতুল বানিয়ে, সেগুলোকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাচানোর মধ্য দিয়ে দর্শকের সামনে কোনো একটি বিষয়কে উপস্থাপন করানোটাই হলো পুতুলনাচ। ধাতু, কাপড়, ঘাস, শোলা, কাগজ, পাথর, মাটি, কাঠসহ কত বিচিত্র জিনিস দিয়ে তৈরি করা হয় পুতুলগুলো। চরিত্র অনুযায়ী রংবেরঙের সাজে তৈরি করে তাকে হাতের সাহায্যে নাচানো হয় সাথে সাথে পুতুলনাচের শিল্পীরা বিভিন্ন রকমের গলার স্বর করে পুতুলগুলোর চরিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আবার কোনো কোনো পুতুলনাচে মানুষ নিজে পুতুল সেজে নাচ করে।

স্বরের কথা যখন আবার আসলো, তাহলে চলো এবার আমরা একটা গান করি এবং গানটির স্বরগুলোকে চিনি। গানটির সাথে যদি আমরা ইচ্ছেমতো পুতুলনাচের ভঙ্গি করে গানের ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলি, কেমন হবে বলতো?

চলো এবার সবাই মিলে একটি গান করি –

সা তে সাঁতার কাটি মোরা সুরে

রে তে রেখা টেনে যাই বহুদূরে

গা তে গান করি এসো গলা খুলে

মা তে মান্য করি গুরুজনে

পা তে পাঠশালা যাই খুশি মনে

ধা তে ধৈর্য ধরি বিপদে

নি তে নৃত্য শিখি পারি যত।

যেভাবে আমরা গানটি গাইব –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সা	া	রে	গা	সা	া	রে	গা	সা	া	রে	গা	মা	া	া	া
সা	০	তে	০	সাঁ	তা	র	কা	টি	০	মো	রা	সু	০	রে	০
রে	া	গা	মা	রে	া	গা	মা	রে	া	গা	মা	পা	া	া	া
রে	০	তে	০	রে	খা	টে	নে	যা	ই	ব	হু	দূ	০	রে	০
গা	া	মা	পা	গা	া	মা	পা	গা	া	মা	পা	ধা	া	া	া
গা	০	তে	০	গা	ন	ক	রি	এ	সো	গ	লা	খু	০	লে	০
মা	া	পা	ধা	মা	া	পা	ধা	মা	া	পা	ধা	নি	া	া	া
মা	০	তে	০	মা	০	ন্য	ক	রি	০	গু	রু	জ	০	নে	০
পা	া	ধা	নি	পা	া	ধা	নি	পা	া	ধা	নি	সা´	া	া	া
পা	০	তে	০	পা	ঠ	শা	লা	যা	ই	খু	শি	ম	০	নে	০
ধা	া	পা	মা	ধা	া	পা	মা	ধা	া	পা	মা	গা	া	া	া
ধা	০	তে	০	ধৈ	র	য	ধ	রি	০	বি	০	প	০	দে	০
নি	া	ধা	পা	নি	া	ধা	পা	মা	া	গা	রে	সা	া	া	া
নি	০	তে	০	নৃ	০	ত্য	শি	খি	০	পা	রি	য	০	ত	০

খেয়াল করেছ এই গানটির মাঝেও আছে নকশা –সুরের নকশা!

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

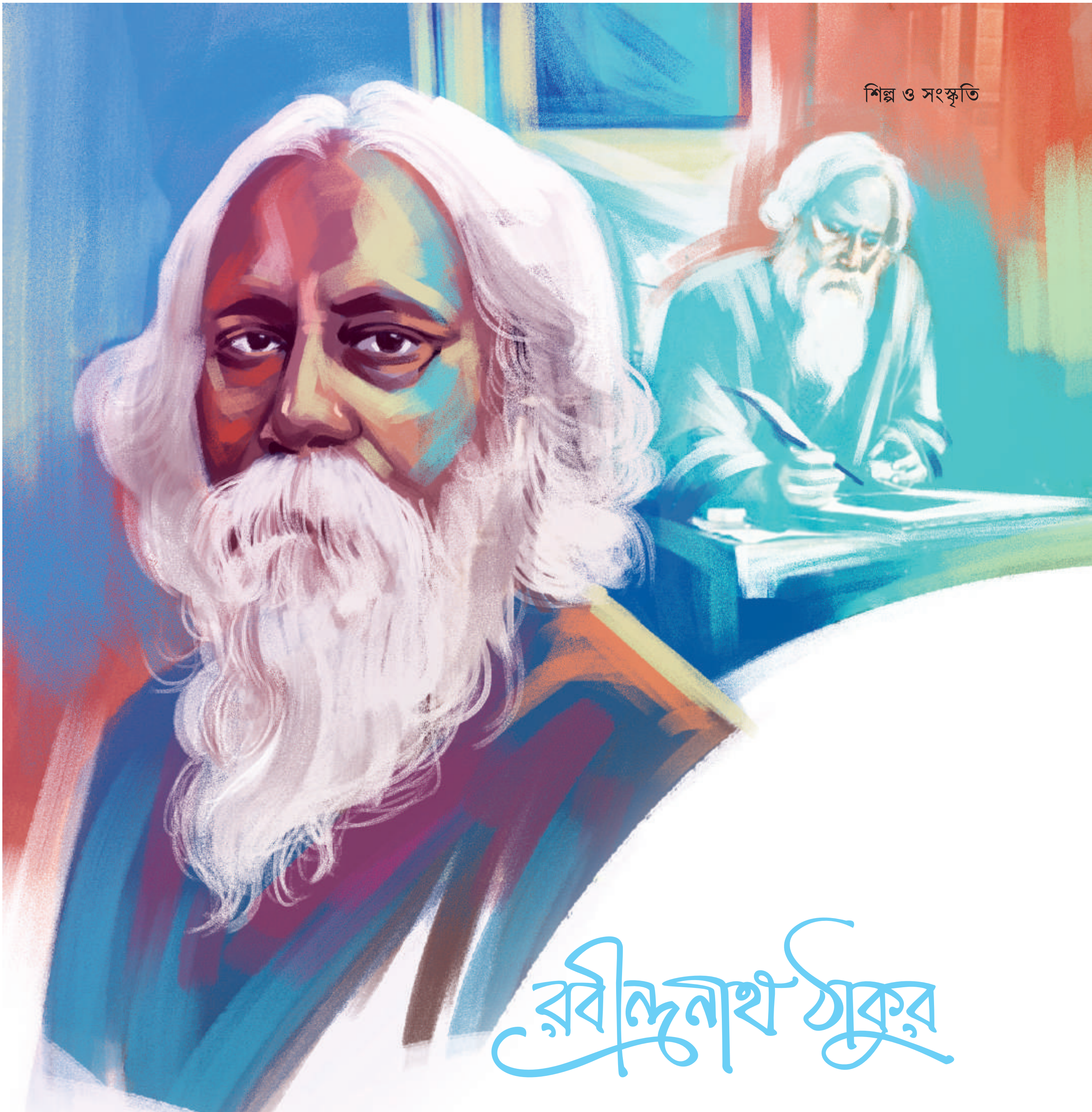

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯১৫ সাল রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘বিচিত্রা স্টুডিও’। বিদেশি ছবির নকল বন্ধ করা এবং তরুণ শিল্পীরা যাতে নিজেদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার চর্চা করতে পারে তা ছিল ‘বিচিত্রা স্টুডিও’ এর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় ‘বিচিত্রা স্টুডিও’। তাতে ভীষণ কষ্ট পেয়ে কবি নিজের কন্যা মীরা দেবীকে লিখেছেন “আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশের চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্য কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলে না। আমার যেটুকু সাধ্য

ছিল আমি তো করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ও প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হতো তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম”।

কবি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব রুপ দিতে ১৯১৯ সালের ৩ জুলাই শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন ‘কলাভবন’। চারু, কারু, নৃত্য, সংগীতসহ শিল্পের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় ‘কলাভবন’।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাসসহ অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে আরেকটি অনন্য সৃষ্টি হলো তাঁর চিত্রমালা। রবীন্দ্রনাথের ভাব আর আবেগের জগৎ ছিল তাঁর সাহিত্য। আর তাঁর রূপের জগত হলো ছবি আঁকার। লেখার মাঝে কাটাকুটির ছলে আঁকা ছবিগুলো ছিল শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অমর চিত্রকলা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্যারিসসহ ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় ১২টি শহরে প্রদর্শিত হয়েছিল। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয় হয়েছে এই চিত্ররাশির মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর আঁকা ছবি

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভরে তুলেছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্ম দিয়ে। শিল্পকলার এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যা রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতার স্পর্শ পায় নি। এতোদিন আমরা রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাসসহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানতাম এবার আমরা বিশ্বজয়ী শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানলাম।

এবার নববর্ষ উদ্‌যাপন করব নিজেদের আঁকা আলপনা ও নকশা করে।

যা করব—

- বৈশাখি উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য আলপনা করার খসড়া পরিকল্পনা করে রাখতে হবে।
- কাগজ কেটে ঝালর বানাব।
- দেশীয় সংস্কৃতির/ বর্ষবরণের নানান পরিবেশনা (নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি) চর্চা করব।
- মঞ্চ ও স্থান সজ্জার জন্য আলপনা ও নকশা করব।
- শ্রেণিকক্ষে মেলা/ উৎসব আয়োজন করব অথবা বিদ্যালয়ের আয়োজনে অংশগ্রহণ করব।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টকর্ম সম্পর্কে আমরা আরও জানতে চেষ্টা করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এই পাঠে আমি যা শিখেছি তা সম্পর্কে লিখি –

কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। যাদের কাজের মাঝেই লুকিয়ে আছে শিল্প। আমাদের প্রায় সকলের বাড়িতে ব্যবহার হয় বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র। মাটি দিয়ে তৈরি ঘর সাজানোর সামগ্রী ও তৈজসপত্র কম বেশি আমরা সকলের ব্যবহার করি। এসো জেনে নেই এমন কিছু কাজের কথা যার মাঝে শিল্প লুকিয়ে আছে।

মৃৎশিল্প

আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পের মধ্যে একটি হচ্ছে মৃৎশিল্প। মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মৃৎশিল্প। কারণ এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে যে এ কাজ হয় তা নয়। এ কাজে পরিষ্কার এঁটেল মাটির প্রয়োজন হয়। যারা মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করেন তাদেরকে কুম্ভকার বা চলিত বাংলায় কুমোর বলা হয়। মাটির তৈরি কলসি, ফুলের টব, সরা, বাসন, সাজের হাঁড়ি, মাটির ব্যাংক, শিশুদের বিভিন্ন খেলনাসমগ্রী, নানা ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করে কুমোরেরা। মাটির তৈরি রকমারি তৈজসপত্র, ঘর সাজানোর জিনিস, খেলনাসমগ্রী ইত্যাদির আজ প্রচুর চাহিদা লক্ষণীয়। তাছাড়া মেয়েদের বিভিন্ন মাটির তৈরি গয়না সহজেই চোখে পড়ে দেশের মেলাগুলোতে ও বিভিন্ন দোকানে। মৃৎশিল্প আমাদের ঐতিহ্যের অংশ।

তাঁতশিল্প

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও তাঁতিরা আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে এদেশের সংস্কৃতি। আদিকাল থেকে ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে চলে আসা আমাদের তাঁতশিল্প দেশে ও বিদেশে সমভাবে সমাদৃত। এই অঞ্চলে উৎপাদিত ফুটিকার্পাস দিয়ে একসময় হাতে কাটা সূক্ষ্ম সুতা তৈরি হতো। সেই সুতা দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে হস্তচালিত তাঁতের কাপড় বোনা হতো। বাংলার জগদ্বিখ্যাত মসলিন সারা বিশ্বে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। এখনও দেশের তাঁতশিল্পীদের তৈরি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, রাজশাহীর রেশম বা সিল্ক, টাঙ্গাইলের শাড়ি, কুমিল্লার খাদি বা খদ্দর, সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি ও গামছা, ঢাকার মিরপুরের বেনারসি, সিলেট ও মৌলভীবাজারের মণিপুরি তাঁত ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের তাঁতের কাপড়ের রয়েছে বিশ্বব্যাপী চাহিদা ও কদর।

বাঁশ-বেতশিল্প

বাংলাদেশের যে কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান লোকজীবনের সঙ্গে মিশে আছে, বাঁশ-বেত তাদের অন্যতম। বাংলাদেশের জনজীবনের খুব কম দিকই আছে যেখানে বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী ব্যবহৃত হয় না। বাঁশ ও বেতের তৈরি কুলা, চালুন, খাঁচা, মই, চাটাই, ধানের গোলা, ঝুড়ি, মোড়া, মাছ ধরার চাঁই, মাথাল, সোফাসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার হয়। তাছাড়া বাঁশের ঘর, বেড়া, ঝাপ, দরমাসহ বাঁশের ও বেতের তৈরি নানা জিনিস বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির প্রতীক। দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি গৃহস্থালি পাত্রসমূহ খুবই আকর্ষণীয়। এসব পাত্র বা ঝুড়িতে বুননের মাধ্যমে নানা ধরনের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। বাঁশিসহ আরও অনেক লোকবাদ্যযন্ত্র বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। ইদানীং নগরজীবনে বাঁশের তৈরি আসবাব, ছাইদানি, ফুলদানি, প্রসাধনী বাক্স, ছবির ফ্রেম, আয়নার ফ্রেম, কলমদানি ইত্যাদিও লক্ষ করা যায়।

এবার আমরা ফিরে আসি আমাদের কাজে।

যা করব—

- আমরা জানার চেষ্টা করব, আমরা যে এলাকাটিতে বা মহল্লাতে কিংবা গ্রামে বসবাস করছি সেখানে এমন কোনো শিল্প বা পেশাজীবীর পরিবার বা গোষ্ঠী আছে কি না। থাকলে তার তালিকা তৈরি করব।
- এবার এর মধ্য থেকে কয়েকটি শিল্পভিত্তিক পেশাকে বাছাই করে সেই পেশাগুলোকে নিয়ে কিছুটা গভীরভাবে ভাববার চেষ্টা করব। এই ভাবনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পও যে জীবিকা নির্বাহে সহায়ক হয় এবং এটিও যে মর্যাদাপূর্ণ কাজ তা উপলব্ধি করা।
- এরপর ঐ নির্দিষ্ট পেশার পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানতে হবে ও বন্ধুখাতায় লিপিবদ্ধ করে নিতে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

হবে।

- দলে ভাগ হয়ে কয়েকটি শিল্পভিত্তিক পেশাজীবীদের কাজকে আরও জানার জন্য তাদের কাজ পরিদর্শন করা বা তাকে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার কাজটি শিখব।

উদাহরণ হিসেবে আমরা মৃৎশিল্পীদের মতো মাটি দিয়ে কিছু বানানোর চেষ্টা করে দেখতে পারি। ঘর সাজানোর জন্য মাটির ফলক দিয়ে রিলিফ নকশা তৈরি করতে পারি। মাটি দিয়ে ফলক তৈরির জন্য আঠালো মাটি বিশেষভাবে উপযোগী।

মাটির ফলক তৈরি করতে যা যা লাগবে—

- আঠালো মাটি
- চোখা মাথার একটি ছুরি/ বাঁশের ছোট ফলা।
- কালি ছাড়া বল পয়েন্ট কলম
- একটি স্কেল
- পানি রাখার পাত্র
- হাত মোছার ন্যাকড়া

যেভাবে করব—

- মাটি থেকে যতটা সম্ভব অন্যান্য উপাদান (নুড়ি, আগাছা, ঘাস ইত্যাদি) বেছে ফেলে দিতে হবে।
- যেকোনো শিল্পকর্ম তৈরির আগে তার একটি খসড়া নকশা করা জরুরি। বন্ধুখাতায় আমরা একটি খসড়া নকশা করে নেবো। নকশায় সঠিক মাপ উল্লেখ করতে পারলে খুব ভালো হয়। প্রতিটি কাজ সেই নকশা অনুসারে করার চেষ্টা করব।
- একটি মাটির দলা নিয়ে তাতে পরিমাণমতো পানি দিয়ে তা ভালোভাবে মাখাতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন পানির পরিমাণ বেশি না হয়ে যায়। মাটি বেশি নরম হয়ে গেলে কাজ করতে অসুবিধে হয়। মাখাতে মাখাতে যখন দেখা যাবে মাটি আর হাতে লেগে থাকছে না, তখনই বোঝা যাবে যে মাটিগুলো এখন কাজের জন্য উপযোগী হয়েছে।
- প্রথমে আমরা মাটি দিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে সেগুলো হাতের আঙুল দিয়ে টিপে টিপে একটা চেপ্টা ফলক বা স্ল্যাব তৈরি করব। ফলকটির উপরের অংশ আমরা স্কেল দিয়ে অথবা বাঁশ বা কাঠের ছোট টুকরো দিয়ে সমান করে নিতে পারি। এই ফলকটার নাম হবে বেইজ স্ল্যাব বা ভিত্তিফলক অর্থাৎ যে স্ল্যাবটার উপর আমরা নকশাটি বসাব। স্ল্যাবটার উপরের দিকে আমরা দুটি ছোট ছিদ্র করে নেবো যাতে পরবর্তীতে সে ছিদ্র দিয়ে সুতা ঢুকিয়ে তা ঝুলানোর উপযোগী করতে পারি।
- আমাদের বেইজ স্ল্যাবটার সাইজ হবে ন্যূনতম দৈর্ঘ্যে ছয় ইঞ্চি, প্রস্থে চার ইঞ্চি আর পুরুত্বে এক ইঞ্চি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- ঠিক বেইজ স্ল্যাবের মতো আমরা আরেকটি স্ল্যাব তৈরি করব যার নাম হবে কাটিং স্ল্যাব। এটার সাইজ হবে ন্যূনতম দৈর্ঘ্যে ছয় ইঞ্চি, প্রস্থে চার ইঞ্চি আর পুরুত্বে আধা ইঞ্চি। আমরা কাটিং স্ল্যাব থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় নকশাগুলো কেটে নেবো।
- আমরা এবার কাগজের উপরে ইচ্ছেমতো নকশা যেমন–ফুল, পাতা, পাখি ইত্যাদি এঁকে নেবো। আঁকার সময় আমরা খেয়াল করে এমনভাবে মেপে করব যেন সম্পূর্ণ নকশাটা বেইজ স্ল্যাব থেকে বড় না হয়ে যায়।
- এবার কাগজের নকশাটা কাটিং স্ল্যাবটার উপর রেখে কালি ছাড়া বল পয়েন্ট কলম দিয়ে হাল্কা চাপ দিয়ে কাটিং স্ল্যাবটার উপর ছাপ দিয়ে এঁকে নেবো।
- তারপর চোখা মাথার একটি ছুরি/ বাঁশের ছোট ফলা দিয়ে নকশাটা কাটিং স্লাব থেকে কেটে
- এবার কেটে নেওয়া নকশাগুলো পরিকল্পনা অনুসারে বেইজ স্ল্যাবটার উপর বসানোর পালা। তবে বসানোর আগে নকশাগুলোর পিছনের অংশে আর বেইজ স্ল্যাবের যে অংশে নকশা বসাবো সে অংশে ছুরি/ বাঁশের ফলা দিয়ে কিছু আঁচড় কেটে দেবো এবং অল্প মাটি মিশ্রিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেবো যাতে নকশার টুকরোগুলো বেইজ স্ল্যাবটার সাথে ভালোভাবে আটকে যায় এবং শুকানোর পরে তা ছুটে না যায়।
- নকশাযুক্ত ফলকটি তৈরি হয়ে গেলে তা ছায়ায় শুকিয়ে নেবো। অন্তত দু'দিন শুকাতে হবে।
- নকশাযুক্ত ফলকটি শক্ত হয়ে এলে আমরা পছন্দমতো রং করতে পারব। তবে প্রথমে একটা সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে নিলে অন্য রংগুলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।
- রং দেওয়া হয়ে গেলে আবারও ছায়ায় ফলকটি শুকিয়ে নেবো।
- তবে চাইলে রং না দিয়েও তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।

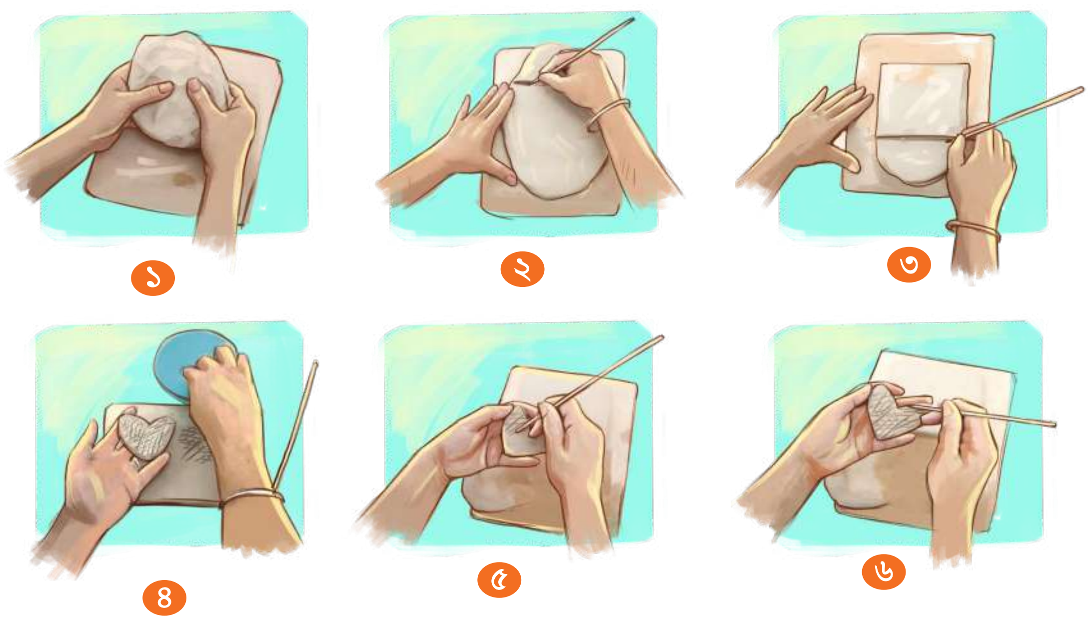

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

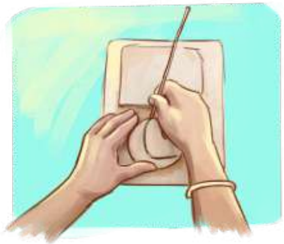
৭

৮

কাজের মাঝে শিল্প খোঁজার এই যাত্রায় আমরা এবার আরেকটা শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করব আর তা হলো নাচ। নাচের যে ভঙ্গিটা সম্পর্কে আমরা জানব তা হলো শ্রমভঙ্গি।

শ্রমভঙ্গি: প্রতিদিন কাজের মধ্যে আমরা নিজেদের অজান্তেই অনেকগুলো দেহভঙ্গি করে থাকি। একটি ভঙ্গি থেকে আরেকটি ভঙ্গি বেশ ভিন্ন। সাধারণত আমি কি কাজ করছি তার উপর নির্ভর করে আমার ভঙ্গি কেমন হবে। কাজ করার ভঙ্গিগুলোকেই আমরা বলছি শ্রমভঙ্গি।
যেমন: কুমোরের মাটির জিনিসপত্র তৈরির ভঙ্গি, কামারের আগুন বাতাস দিয়ে লোহা নরম করার ভঙ্গি, মাটি কাটার ভঙ্গি, তাঁত বোনার ভঙ্গি, ছাদ পেটানোর ভঙ্গি, কয়লা উত্তোলন, ইট ভাঙার ভঙ্গি, কাঠ চেরা ইত্যাদি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম 'সংগ্রাম', ক্যানভাসে তেলরং, ১৯৭৬

শ্রমভঙ্গিগুলোকে যদি তালের সাথে মিলানো যায় তবে তো মজার একটা শিল্প সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে এবার আমরা একটা তাল সম্পর্কে জানি। আমরা কিন্তু হাতের তালির সাহায্যে খুব সহজে তালের ধারণা পেতে পারি। এই পাঠে আমরা দাদরা তাল সম্পর্কে জানব।

দাদরা: দাদরা তালটি ছয় মাত্রার যা 'তিন তিন' মাত্রার সমান দুটি ছন্দে বিভক্ত একটি সমপদী তাল। এইবার আমরা দেখব কিভাবে তালটি সহজে বুঝতে পারি।

আমরা তো ১, ২, ৩, গুনতে পারি, তাইনা? এভাবে পর পর ১, ২, ৩, ১, ২, ৩ অথবা ১, ২, ৩ । ৪, ৫, ৬ গুনেই কিন্তু আমরা দাদরা তালের মাত্রা ৩।৩ ছন্দ প্রকাশ করতে পারি। প্রথম মাত্রায় তালি দিয়ে ১, ২, ৩ এবং চতুর্থ মাত্রায় খালি বা ফাঁকা (তালি না দিয়ে) ৪, ৫, ৬ গুনব। প্রথম মাত্রায় তালি দেওয়াকে বলা হয় 'সোম' এবং চতুর্থ মাত্রায় হাতে তালি না দিয়ে সরিয়ে ফাঁকা রাখাকে বলা হয় ফাঁক। বিভিন্ন পশুপাখির চলনেও আলাদা আলাদা ছন্দ দেখা যায় যেমন হাতি ত্রিমাত্রিক, ঘোড়া চতুর্মাত্রিক প্রভৃতি।

প্রথম মাত্রায় তালি দেওয়াকে বলা হয় 'সোম'

চতুর্থ মাত্রায় দুই তালু ফাঁকা রাখাকে বলা হয় ফাঁক।

দাদরা তালের বোল হলো

।	ধা	ধি	না	।	না	তি	না	।	ধা
	১	২	৩		৪	৫	৬		১

এবার চলো আমরা হাতে তালির সাহায্যে দাদরা তালের সাথে ভঙ্গি মিলিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করে মনের অনুভূতিটা প্রকাশ করি।

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে -
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার — ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি, আসল কাঁদন
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে —
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগ বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গান এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

আজ জাগল সাগর, হাসল মরু
কাঁপল ভূধর, কানন তরু
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে।
মন ছুটছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!!
(সংক্ষেপিত)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি গান ও কবিতা লিখেছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কাব্যের বৃহৎ অংশজুড়ে রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের দিনলিপি।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। বস্তুত তিনি গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও আচারসর্বস্বতা থেকে দেশবাসীর মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

তিনি স্বদেশী গানকে স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বহারা শ্রেণির গণসংগীতে রূপান্তরিত করেন। হুগলি জেলে বসে নজরুল রচনা করেন 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল', আর বহরমপুর জেলে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া' এ বিখ্যাত গান দুটি।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। তিনি বাংলা গজলের স্রষ্টা আর শ্যামা সংগীতে যুক্ত করেছিলেন অনন্য মাত্রা। তাঁর অধিকাংশ গজলের বাণীই উৎকৃষ্ট কবিতা এবং তার সুর রাগভিত্তিক। আঙ্গিকের দিক থেকে সেগুলো উর্দু গজলের মতো তালযুক্ত ও তালছাড়া গীত। রেকর্ড, বেতার ও মঞ্চের পর নজরুল ১৯৩৪ সালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি প্রথমে যে ছায়াছবির জন্য কাজ করেন সেটি ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি ‘ধ্রুব’ (১৯৩৪)। এ ছায়াছবির পরিচালনা, সংগীত রচনা, সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা এবং নারদের ভূমিকায় অভিনয় ও নারদের চারটি গানের প্লেব্যাক নজরুল নিজেই করেন।

এসো আমরা আমাদের খুঁজে বের করা শিল্পভিত্তিক পেশাজীবীদের সম্মান জানানোর জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে বিশ্বের সকল পেশাজীবীর শ্রমিক দিবস পালন করি।

যা করব—

- দাদরা তালের চর্চা করতে পারি।
- বিভিন্ন রকম শ্রমভঙ্গির চর্চা করতে পারি।
- তাল সহযোগে কবিতাটি চর্চা করতে পারি।
- আমরা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করব।

এই পাঠ থেকে জেনে আমার পছন্দের শিল্প সম্পর্কে লিখি–

প্রাণ প্রকৃতি

রাফি স্কুল থেকে ফিরছে। পথে কাঠবিড়ালি, পাখি, নদীর সাথে দেখা

রাফি: কাঠবিড়ালি, ও কাঠবিড়ালি কি হয়েছে যাও না বলি।

কাঠবিড়ালি: কি হবে আর কথা শুনে বড্ড কষ্ট পেলাম মনে। বনবাদাড় সব উজাড় করে থাকার জায়গা নিয়েছ কেড়ে।

রাফি: ও পাখিরা কোথায় যাও সবাই দলে দলে কেনোই বা যাচ্ছ চলে?

পাখি: কোথায় যাব তা জানি না তবে যাচ্ছি চলে এটাই জানা।

রাফি: এখানে থাকতে কিসের মানা?

পাখি: গাছ কেটেছ, আবাস ভেঙেছ কি আর হবে থেকে তাই চলেছি ঝাঁকে ঝাঁকে

নদী : আমায় মেরেছ, দখল করেছ দুষিত করেছ, প্রাণ কেড়েছ, দালান করেছ বাঁকে বাঁকে। তাই চলেছি অজানার দিকে।

রাফি: না, চলে যেও না, কথা শোনো একখানা।

প্রজাপতি: ফিরে যাও খোকা পিছু ডেকো না। আমরা চলেছি অজানা পথে বিদায় নিলাম এখান হতে।

রাফি: তবে কি আর খেলতে পারব না তোমাদের সাথে?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাখি: আরে বোকা মানুষ গাছ না থাকলে অক্সিজেন পাবে কি করে?

কাঠবিড়ালি: বিষাক্ত হয়ে আসবে চারপাশ নিশ্বাস নিতে করবে হাঁস ফাস।

প্রজাপতি: তিলে তিলে মরবে সবে। নিজের ধ্বংস নিজ হাতে, কে এমন দেখেছে কবে?

নদী: বিরানভূমি হবে দেশ নিজ হাতে ধ্বংস করছ স্বদেশ।

রাফি:না না, এমন করে বলো না, এমন পৃথিবী আমরা চাই না।

পাখি: না চাইলে যাও লেগে পড়ো কাজে, প্রকৃতিকে সাজাও সবুজে সবুজে।

নদী: সুন্দর করে তোলো পৃথিবী। গাছ, পাখি, নদী বাঁচাও সবি।

প্রজাপতি: গাছগাছালিতে সব দাও ভরে, আমরাও ফিরব আপন ঘরে।

সবাই: হাসিখুশিতে উঠব মেতে, আনন্দেতে বাঁচব একসাথে। যাও, দেরি কোরো না সবাইকে হবে বোঝাতে....

আমরা চাইলেই কিন্তু প্রকৃতিকে বাঁচাতে পারি। কীভাবে? চলো এর উত্তরটা আমরা খুঁজে দেখি মজার একটি কাজের মাধ্যমে।

কাজটির নাম দিলাম-**সবুজ ডাকে আজ আমায়।**
আমাদের জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার অনেক কিছুই আমরা পাই গাছ থেকে। আমাদের লেখা কাগজও হয় গাছ থেকে। আমরা recycle বা পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের ব্যবহার করা কাগজ নষ্ট না করে তা দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারি।

এই কাজটি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন প্রথমে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো:

১। পুরনো খবরের কাগজ/পত্রিকা/পুরনো লেখার কাগজ

২। পানি

৩। বড় একটা পাত্র/বালতি

৪। চালনি/নেট/পাতলা সুতির কাপড়

৫। সবজি/ফুল গাছের ছোট বীজ।

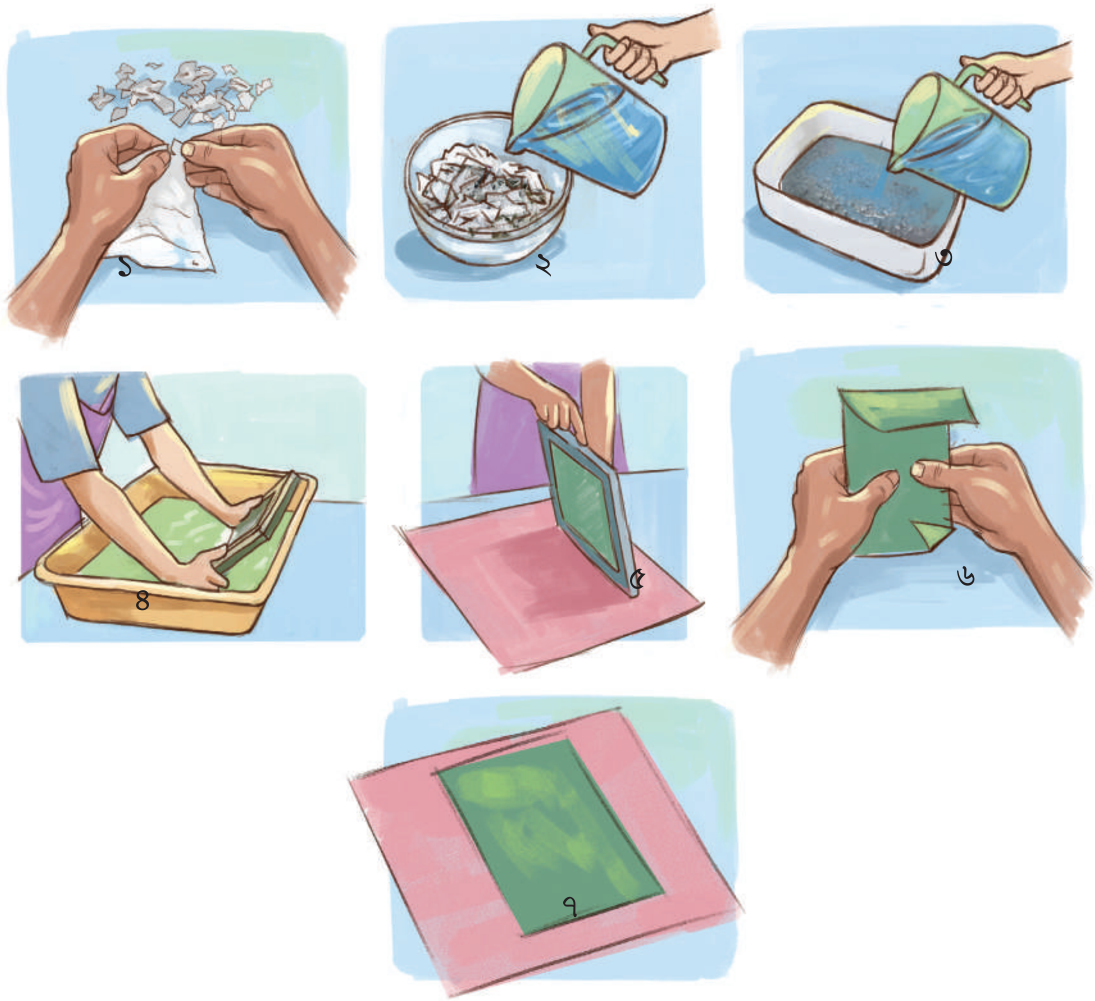

যেভাবে কাজটি করব—

- প্রথমে পুরনো কাগজ কেটে বা ছিঁড়ে একটা বড় পাত্রে নিতে হবে। তারপর সেই পাত্রে প্রয়োজন মতো পানি নিয়ে নিতে হবে। এই অবস্থায় বেশ কিছু সময় রেখে দিলে দেখা যাবে যে কাগজগুলো মণ্ডে পরিণত হয়েছে। মণ্ড যদি ঘন থাকে তাহলে আরও কিছু পানি মিশিয়ে পাতলা করে নিতে হবে। যদি সম্ভব হয় আমার কোনো প্রাকৃতিক আঠা মণ্ডের সাথে মিশিয়ে নিতে পারি।
- এরপর সেই তরল মণ্ডের মিশ্রণটি একটা চালনি/নেট/পাতলা সুতি কাপড়ে ঢেলে ছড়িয়ে দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে করে মণ্ডটি সবদিকে সমান পুরু হয়ে বসে যায়। এরপর কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে যাতে করে সব পানি ঝরে যায়।

- ভেজা থাকতেই মণ্ডের আস্তরণটির উপর দুচারটি বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন বীজগুলো মণ্ডের আস্তরণের সাথে লেগে যায়। এরপর খুব সতর্কতার সাথে চালনি/কাপড় থেকে মণ্ডের আস্তরণটি তুলে ফেলতে হবে যাতে করে কোনোভাবে এটি ছিঁড়ে না যায়।
- এবার এটিকে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। শুকিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে এটি আবার কাগজে পরিণত হয়েছে।

পুরনো কাগজ থেকে যেই নতুন কাগজ তৈরি করা হলো, এবার সেই কাগজ দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের শুভেচ্ছা কার্ড বানাব। নিজের হাতে তৈরি শুভেচ্ছা কার্ডগুলো যেকোনো উৎসব উপলক্ষ্যে শিক্ষক/বন্ধু/আত্মীয়কে উপহার দেবো। কার্ডটি দেবার সময় কার্ডের ভেতরে লিখে দিতে হবে যেন খুঁজে দেখা হয় কাগজের কোনো অংশে বীজ আছে। বীজের অংশটুকু ছিড়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে করে সেই বীজ থেকে গাছ হয়। এভাবেই আমরা আমাদের বাগানটা স্কুলে বা বাড়িতে করতে পারি।

এবার আমরা শিল্পী এস এম সুলতানের আঁকা কিছু ছবি দেখব এবং তাঁর সম্পর্কে জানব।

এস এম সুলতান

সুলতানের জন্ম ১৯২৩ সালের ১০ই আগস্ট নড়াইল জেলার মাছিমদিয়া গ্রামে। তাঁর পুরো নাম শেখ মুহাম্মাদ সুলতান। ছোটবেলা থেকে তিনি ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। তাঁর ছবির মূল বিষয় ছিল এই বাংলার মাটি আর এর জনমানুষ। প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভালোবাসা। মননশীল নতুন প্রজন্ম গড়ার জন্য তিনি নড়াইলে প্রতিষ্ঠা করেন শিশুস্বর্গ। সেখানে তিনি একটা বড় নৌকা তৈরি করেছিলেন। যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা নৌকা ভ্রমণ করতে করতে ছবি আঁকার মজার অভিজ্ঞতা পায়।

শিল্পী এস এম সুলতানের কিছু শিল্পকর্ম

‘জমি কর্ষণে যাত্রা-২’, তেলরং ১৯৮৯

‘ফেরা’ তেলরং ১৯৯০

কৃষকরাই এই দেশের মূল প্রাণশক্তি বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই শিল্পী সুলতানের ছবিতে কৃষকদেরই আমরা খুঁজে পাই মুখ্য ভূমিকায়। তাঁর ছবিগুলোতে কৃষকের অদম্য বীরত্ব, বেঁচে থাকার শক্তি এবং ভূমির প্রতি অবিরাম প্রতিশ্রুতি চিত্রিত হয়েছে। কৃষকরাই দেশের প্রকৃত নায়ক। একজন নায়ক কি কখনও দুর্বল হতে পারে? এইজন্য তাদের একেবারে পেশিবহুল হতে হবে। ফসল তোলার জন্য তারা রুক্ষ জমিতে লাঙলের ফলক ঠেলে দেয়। তারা এখানে না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ত। তারা আমাদের জাতির বীর সন্তান। যদিও বাস্তবে তাদের শারীরিক গঠন এমন নয়। সুলতান তাদের শক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি তাদের জন্য একটি সমৃদ্ধ জীবন কামনা করেছিলেন। সুলতান তাঁর ছবির মধ্য দিয়েই তাদের বীরত্বগাথাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

শিল্পী সুলতানের মতো প্রকৃতির প্রতি আমাদেরও ভালোবাসা প্রকাশ করা খুব দরকার। সবুজকে বাঁচিয়ে রাখা, সবুজকে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।

যা করব—

- পুরনো কাগজ recycling করে নতুন কাগজ বানাব।
- সেই নতুন কাগজে বীজ সংযুক্ত করব।
- বানানো নতুন কাগজ দিয়ে নিজের মতো নকশা করে কার্ড বানাব।
- বানানো কার্ডগুলো বন্ধুদের উপহার দেবো।
- বন্ধুর কাছ থেকে প্রাপ্ত বীজযুক্ত কার্ডটি মাটিতে লাগিয়ে দেবো এবং তার পরিচর্যা করব।
- বীজ থেকে গাছ হওয়ার প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করব। চাইলে গাছটির বেড়ে ওঠার গল্প বন্ধুখাতায় এঁকে বা লিখে রাখতে পারি।
- প্রতিদিনের কাজে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে আমাদের দ্বারা পরিবেশদূষণ না হয় এবং প্রকৃতির ক্ষতি না হয়।
- অপচয় রোধে এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য নিজ উদ্যোগে যা যা কিছু পুন:ব্যবহার বা recycle করা যায় তার তালিকা করব এবং নিজ পরিবারে তা ব্যবহার করব।
- শিল্পী এস এম সুলতানের শিল্পজগৎ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে আরও জানার চেষ্টা করব।

আমার এলাকার পরিবেশ নিয়ে লিখি–

প্রাণের গান

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একটি বিশেষ অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠানে নিজস্বতা রয়েছে। আঞ্চলিক পরিচয় বহনকারী সব বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বা ধরনই হলো সংস্কৃতি। তাই বলা যায় আঞ্চলিক সংস্কৃতি হলো অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতি বা জীবনধারা।

ষড়ঋতুর এই দেশে ঋতুকে কেন্দ্র করে অনেক অঞ্চলে অনেক রকম উৎসব উদ্‌যাপন হয়ে থাকে। আর সেইসব উৎসবের জন্য হয়ে থাকে নানা রকমের গান-বাজনা, পালা-পার্বণ। এইবার আমরা নদী, বর্ষাকে ঘিরে গান সম্পর্কে জানব। ভাটিয়ালি আর সারি গানের নাম আমরা হয়ত শুনে থাকব। চলো, আমরা এ সম্পর্কে পরিবার বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে জানার বা শোনার চেষ্টা করি।

ভাটিয়ালি গান

বাংলা লোকসংগীতে একটি অন্যতম ধারা হলো ভাটি অঞ্চলের ভাটিয়ালি গান। নদীর স্রোতধারা যেদিকে যায় সেদিককে ভাটি বলে। নদীবিধৌত বাংলার মানুষের প্রাণের এ গান হচ্ছে নৌকা, মাঝি, গুন-সম্পর্কিত গান।

ভাটিয়ালি গানের বৈশিষ্ট্য হলো এটি তাল-নির্ভর নয়। মন উদাস করা কথা ও সুরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় এ গানে। নদীর বুকে নাও ভাসিয়ে দূর দেশে যাওয়ার ফলে প্রিয়জনের সান্নিধ্য পেতে মন আকুল করা গান আসে মাঝির কণ্ঠে। গানের মাঝে দীর্ঘ সুরের টান দেখা যায়। গলা ছেড়ে লম্বা টানে গাওয়া সেই গানে যেন মাঝির মনের সব আকুলতা আর আবেগ প্রকাশ পায়।

আবার ভাটির টানে নৌকা চলে সহজে। তখন নৌকা চালাতে বেগ পেতে হয় না। আর এই সহজ চলার গতি আর ছন্দে মাঝি দরদ দিয়ে গান গায়। বাংলার সহজ সরল মানুষের আবেগের সুরে গাওয়া এই গান আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করে। এই গান চর্চার মাধ্যমে আমরা এই প্রাণের সুরকে বাঁচিয়ে রাখব।

সারি গান

সারি গান সারি শব্দ থেকে এসেছে। সারি গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এ গান দলগতভাবে গাওয়া হয়। একজন মূল গায়ক বা বয়াতি থাকেন আর তার সাথে থাকেন তার সঙ্গী গায়ক বা দোহারগণ। দোহারগণ তার সাথে সমস্বরে সুর মিলান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সারি গানের চর্চা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, রাজশাহীর চলনবিল, পাবনা, বরিশাল, যশোর, রাজবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে গাওয়া হয় সারি গান। সাধারণত খাল-বিল, হাওর, নদী অঞ্চলে সারি গান গাওয়া হয়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এ গান গাওয়ার ধুম পড়ে যায়। মধ্যযুগে কবিদের লেখায় সারি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে নৌকাবাইচের সাথে সারি গান গাওয়ার প্রচলন হয়।

সারি গানকে কর্মসংগীতও বলা হয়। কারণ সারি গান সাধারণত বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত। একটা সময়ে কৃষকের ধান কাটার সময়, ধান তোলা, ছাদ পেটানো ইত্যাদি কাজের সাথে এই গান গাওয়ার প্রচলন হয়। কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে সারি গানের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। যেমন—নৌকাবাইচের গান, ছাদ পেটানোর গান, ফসল কাটার গান ইত্যাদি।

যখন দলগতভাবে একই কাজ করা হয় তখন কাজে ছন্দ ও গতি আনতে সারি গান ধরা হয়। গানের ছন্দে আর তালে তালে সবাই মিলে একই সাথে নৌকার বৈঠা বাইতে, বাসাবাড়ির ছাদ পেটাতে, ভারি কিছু সরাতে সারি গান গাওয়া হয়।

সাধারণত সারি গান দ্রুতলয়ে ও তালে গাওয়া হয়। তালের বিষয়টা যেহেতু আসল তাহলে এবার আমরা নতুন আরেকটি তাল সম্পর্কে একটু জেনে নিই। আমরা এবার কাহারবা তাল সম্পর্কে জানব।

কাহারবা তাল

কাহারবা ৮ মাত্রার একটি সমপদী তাল। এই তালে রয়েছে দুটি ভাগ, প্রতিটি ভাগে রয়েছে ৪টি করে মাত্রা। আমরা ১, ২, ৩, ৪ । ১, ২, ৩, ৪, গুনে অথবা ১, ২, ৩, ৪। ৫, ৬, ৭, ৮ গুণে কাহারবা তালের মাত্রা ৪।৪ ছন্দ প্রকাশ করতে পারি। প্রথম মাত্রায় তালি দিয়ে ১, ২, ৩, ৪ এবং পঞ্চম মাত্রায় খালি বা ফাঁকা (তালি না দিয়ে) ৫, ৬, ৭, ৮ গুণব। প্রথম মাত্রায় বা তালিতে 'সোম' এবং পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক বা খালি। স্কুলে শরীরচর্চার সময় আমরা যে তালে তালে 'ডান-বাম, ডান-বাম' পা মিলিয়ে থাকি তা-ও কিন্তু চার মাত্রার ছন্দে করে থাকি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কাহারবা তালের বোল

+					০					+
ধা	গে	তে	টে	।	না	গে	ধি	না	।	ধা
১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	।	১

সারি গান শুধু শ্রমসংগীত না, বরং গাওয়ার আনন্দ বা বিনোদনের খোরাক জোগায়। আবার প্রতিযোগিতার গান হিসেবেও সমাদৃত। গানের তালের সাথে অঙ্গভঙ্গির প্রকাশ ঘটানোর জন্য এবার প্রথমে আমরা সারিভঙ্গি সম্পর্কে জানব।

সারিভঙ্গি

দলগতভাবে একই ভঙ্গি করাটাই হলো সারিভঙ্গি। সাধারনত কোনো একটি কাজ যখন আমরা দলগতভাবে করি, তখন যে দেহভঙ্গিটা দেখতে পাই, সেটিই সারিভঙ্গি। এর সাথে শ্রমের একটা যোগসূত্র আছে। এক কথায় দলগত শ্রমভঙ্গি হলো সারিভঙ্গি। যেমন: অনেকে মিলে নৌকা বাওয়া, ছাদ পেটানো, কোনো ভারি জিনিস উপরে তোলার সময় যে শারীরিক ভঙ্গি হয় তা-ই সারিভঙ্গি।

আমরা কাহারবা তালে দলগতভাবে নিচের গানটা অনুশীলন করতে পারি এবং সম্মিলিতভাবে গাইতে পারি। সাথে সাথে দলের মধ্য হতে কেউ চাইলে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গানের ভাবটি নিজের মতো স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারি।

নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়া দে

ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া চলুক মাঝ দইরা দিয়া।। হো

উড়ালি বিড়ালি বাওয়ে নাওয়ের বাদাম নড়ে (আরে)।

আথালি পাথালি পানি ছলাৎ ছলাৎ করে রে।

আরে খল খলাইয়া হাইসা উঠে

বৈঠার হাতল চাইয়া হাসে, বৈঠার হাতল চাইয়া (হাতে)।।

ঢেউয়ের তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গলই কাঁপে

চির চিরাইয়া নাওয়ের ছৈয়ায় রোইদ তুফান মাপে,

মাপে রোইদ তুফান মাপে

(আরে) চিরলি পিরলি ফুলে ভ্রমর-ভ্রমরী খেলে রে।

বাদল উদালি গায়ে পানিতে জমিতে হেলে রে

আরে তুর তুরাইয়া আইলো দেওয়া জিলকী হাতে লইয়া

আইলো জিলকী হাতে লইয়া।

শালি ধানের শ্যামলা বনে হইলদা পঙ্খি ডাকে

চিকমিকাইয়া হাসে রে চান সইশা খেতের ফাঁকে

ফাঁকে সইশা খেতের ফাঁকে

সোনালি রূপালি রঙে রাঙা হইল (আরে)।

মিতালী পাতাইতাম মুই মনের মিতা পাইতাম যদি রে

আরে ঝিলমিলাইয়া খালর পানি নাচে থৈইয়া থৈইয়া

পানি নাচে থৈইয়া থৈইয়া।।

আমরা কি আমাদের লোকগানের বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদের কথা জানি? চলো আমরা তাঁর সম্পর্কে জেনে নেই—

আব্বাসউদ্দীন আহমেদ

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, যিনি ভাওয়াইয়া গানকে জনপ্রিয় করার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী, তিনি ব্রিটিশ ভারতের কোচবিহার জেলায় ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদী কম। এ অঞ্চলে গরুগাড়ি চলার প্রচলন ছিল। গাড়োয়ান চলার সময় আবেগে গান ধরতেন। উঁচুনিচু রাস্তায় গাড়ি চলার সময়ে গলার স্বরে ভাঁজ পড়ত। গলার স্বরে ভাঁজ পড়ার বিশেষ গান গাওয়ার রীতিই ভাওয়াইয়া গান।

স্কুল-কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে সংগীতের প্রতি আব্বাসউদ্দীনের আগ্রহ গড়ে ওঠে। তিনি বিভিন্ন ধরনের গান করেছেন যেমন—ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদী, দেহতত্ত্ব, পালাগান, লোকগীতি, আধুনিক গান এবং দেশাত্মবোধক গান। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন ও গোলাম মোস্তফা রচিত ইসলামিক বিষয়ের উপর গানও গেয়েছেন। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন খ্যাতি লাভ করেন মূলত লোকগানের গায়ক হিসেবে গ্রাম ও শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে এবং তাঁর গান রেকর্ড করে।

আব্বাসউদ্দীন রক্ষণশীল বাঙালি মুসলিম সমাজে সংগীতকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তোলেন।
আব্বাসউদ্দীন ছিলেন প্রথম গায়ক যিনি কাজী নজরুল ইসলামের 'ও মন রমজানেরও রোজার শেষে' গানটিতে কণ্ঠ দেন, যা বাংলাদেশে ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপনের একটি অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে।
সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি প্রাইড অফ পারফরম্যান্স, শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার এবং স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অনেক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেন।

আর কতকাল ভাসব আমি দুঃখের সারি গাইয়া জনম গেল ঘাটে ঘাটে আমার জনম গেল ঘাটে ঘাটে ভাঙ্গা তরী বাইয়া রে আমার ভাঙ্গা তরী বাইয়া।। পরের বোঝা বইয়া বইয়া নৌকার গলুই গেছে খইয়া রে। আমার নিজের বোঝা কে বহিবে রে আমার নিজের বোঝা কে বহিবে। রাখব কোথায় যাইয়া রে আমি রাখব কোথায় যাইয়া।। এই জীবনে দেখলাম নদীর কতই ভাঙ্গা গড়া আমার দেহতরী ভাঙল শুধু না যা দিল জোড়া।। আমার ভবে কেউ কি আছে দুঃখ কবো কাহার কাছে রে আমি রইলাম শুধু দয়াল আল্লাহ রে আমি রইলাম শুধু দয়াল আল্লাহ তোমার পানে চাইয়া রে আমি তোমার পানে চাইয়া।।	নোঙ্গর ছাড়িয়া নায়ের দেরে দে মাঝি ভাই, বাদাম উড়াইয়া নায়ের দেরে দে মাঝি ভাই। গাঞ্জে ডাইকাছে দেখ বান, ওরে গাঞ্জে ডাইকাছে দেখ বান।। হাল ধরিয়া বইসো মাঝি বৈঠা নেব হাতে মোরা বৈঠা নেব হাতে। সাগর দইরা পাড়ি দেব, ভয় কি আছে তাতে রে মাঝি ভাই।। উথাল পাথাল গাঞ্জের পানি, আমরা না তাই ডরি হায় রে আমরা না তাই ডরি। সাগর পারের মাঝি মোরা. সঙ্গী তুফান ঝড়ি রে মাঝি ভাই।। হেইয় হো হেইয়া হো হেইয় হো হেইয়া হো হোক না আকাশ মেঘে কালা কিনার বহু দূর হায়রে কিনার বহু দূর বৈঠার ঘায়ে মেঘের পাহাড় কইরা দেব দূর রে মাঝি ভাই আল্লাহ নামের তরী আমরা রসূল নামের ঘোড়া, হায়রে রসূল নামের ঘোড়া। মা ফাতেমা নামের বাদাম মাস্তুলেতে উড়া রে মাঝি ভাই।।

যা করব—

- উপরের বক্সে গান দুটির কথাগুলো পড়ব। এই গান দুটি যেকোনো মাধ্যমে শুনব। তারপর ভাটিয়ালি ও সারি গানের বৈশিষ্ট্য জেনে উপরের কোনটি সারি আর কোনটি ভাটিয়ালি গান তা বইতে চিহ্নিত করব।
- নিজ অঞ্চলে কোনো আঞ্চলিক গান প্রচলিত আছে কি না জেনে নিয়ে অবশ্যই তা বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- নিজ অঞ্চলের আঞ্চলিক গান ক্লাসে সবাইকে চাইলে গেয়েও শোনাতে পারি।
- আঞ্চলিক গানের সাথে কেউ চাইলে বিভিন্ন মুদ্রা ও চলনের মাধ্যমে নাচ চর্চা করে তা ক্লাসে পরিবেশন করেও দেখাতে পারি।
- শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদের শিল্প সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এই পাঠে আমি যা শিখেছি তা সম্পর্কে লিখি–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চিত্রলেখা

নকশা সম্পর্কে আগের পাঠগুলোতে আমরা জেনেছি সাথে সাথে কিছুটা অনুশীলনও করেছি। এই পাঠে আমরা গল্পের বিষয়কে ভেবে তার সাথে মিলিয়ে ছবি আঁকব। স্বাধীনভাবে মনের ভাবকে প্রকাশ করব ছবি আঁকার মধ্যদিয়ে। তাইতো এই পাঠের নাম চিত্রলেখা। এই পাঠে যে গল্পটি আমরা পড়ব, তার নাম আমি। গল্পটি লিখেছেন লীলা মজুমদার। গল্পটি কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এই গল্পটি নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে, যা গল্পের শেষে দেওয়া আছে।

আমি

লীলা মজুমদার

এই যেটাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি, সেটাকে কি লাঠি ভেবেছ? মোটেই না। ওটা হলো গিয়ে আমাদের চাকর জগুর ছাতার বাঁট। জগু ওটাকে হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে ট্রামে চেপে বাজারে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দুষ্টু লোক ওর মধ্যে একটা আধপোড়া বিড়ি ফেলে দিয়েছিল। তাই ছাতার কাপড়চোপড় পুড়ে একাকার। জগুর রাগ দেখে কে। বাড়ি এসে ছুঁড়ে ওটাকে সিঁড়ির নীচে ফেলে দিয়েছিল। আমি লোহার খোঁচাগুলো ছাড়িয়ে ওটাকে নিয়েছি।

লাঠির আগায় পুঁটলি বাঁধা দেখেছ? ওতে আমার টিফিন আছে। পিসিমার ডুলি থেকে বের করে নিয়েছি। ওরা আমাকে কেউ কিছু দেয় না, তাই নিজেই নিতে হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে কালোমতন একটা কী যাচ্ছে দেখেছ? ওটা ছোটুকার কুকুর, পুকি। কোনো কিছু আমার নয়। খালি প্যান্টটা আর শার্টটা। জুতোটাও গন্টুর। ওকে না বলে নিয়েছি।

কোথায় যাচ্ছি জানো? রামধনুর খোঁজে। কেন জানো? রামধনুর গোড়ার খুঁটিতে এক ঘড়া সোনা পোঁতা থাকে নাকি, তাই। সোনা দিয়ে কী করব জানো? এক-শিংওয়ালা একটা ঘোড়া কিনব। কেন কিনব বলব? ওতে চেপে দিদিমার কাছে ফিরে যাব বলে।

দিদিমার কাছে কেন যাব জানতে চাও? দিদিমা আমাকে দারুণ ভালোবাসে, তাই। আমার জন্যে নারকেল-নাড়ু বানায়, ঘুড়ি কেনে, আপেল কেনে, রাত জাগতে দেয়, পড়তে বলে না, কেউ বকলে রাগ করে, কেউ নালিশ করলে বুকে টেনে নেয়, ঢোল পিটিয়ে ঘুম ভাঙালে হাসে, পড়ে গিয়ে সারা গায়ে কাদা লাগলে কোলে নেয়।

আমি খুব খারাপ ছেলে, তা জানো? মা বাবা ছোটকা, পিসিমা, বড়দি, মেজদি, সব্বাই বলেছে, আমার মতো খারাপ ছেলে ওরা কোথাও দেখেনি। আমি ঘুম থেকে উঠতে চাই না, দাঁত মাজি না, পড়তে চাই না, খাতা পেন্সিল খুঁজে পাই না, বই ছিঁড়ি, স্নান করতে দেরি করি, মুখোমুখি উত্তর দিই, বড়োদের কথার অবাধ্য হই। আমার মতো দুষ্টু ছেলে হয় না। জানো, আমি না বলে ছোড়দির লজেঞ্চুষ সব খেয়ে ফেলেছিলাম, একটাও রাখিনি!

জানো, আমি ভালো করে ভাত খাই না, ফেলি, ছড়াই, রাগমাগ করি, খালিখালি কাঁচা আম খেতে চাই, বাতাসা খেতে চাই। আমি দিদিমার কাছে চলে যাচ্ছি। দিদিমা আমাকে ঝকঝকে মাজা কাঁসার গেলাসে করে জল খেতে দেয় আর হাতে একটা লালচে বাতাসা দেয়। আমি জলের মধ্যে, বাতাসাটাকে যেই ফেলি, বাতাসাটাও অমনি জল-টুস-টুস হয়ে ডুবে যায়। তক্ষুণি চো চো করে জলটা খেয়ে ফেলতে হয়। নইলে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আমার দিদিমা দুপুরবেলায় কেষ্টচূড়া গাছের নীচে মাদুর পেতে, বালিশ নিয়ে আমার পাশে শুয়ে, আমাকে গল্প বলে। সব সত্যি গল্প। দিদিমার বাবা-কাকারা কেমন গোরাই নদীতে কুমির দেখেছিল, তাদের বুড়ি জেঠিমাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর যেই-না মাঝিরা নৌকো করে গিয়ে কুমিরের মাথায় দাঁড়ের বাড়ি মেরেছে, অমনি বুড়িকে ছেড়ে দিয়েছে। আর ওরাও নৌকোতে তুলে নিয়েছে। আর বুড়ি কেঁদে কেঁদে বলছে, বাঁচালি বাপ, বেঁচে থাক বাপ আমার আমসত্ত্ব শুকোয়নি আর আমাকে কিনা কুমিরে নিলে!

আমার দিদিমা এই সব গল্প বলে আর ছোট্ট কাগজের ঠোঙা থেকে আমার জন্যে আমসত্ত্ব বের করে দেয়। আমি চেটে চেটে খাই আর দিদিমা আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দেয়।

ওরা বলে, বাবা-কাকারা যখন কাটোয়া গেছিল আর আমি দিদিমার কাছে দু-মাস ছিলুম, দিদিমা তখন আমার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। আমার বাবা মা এইরকম বলে।

একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি দিদিমা আর আমি মটকা চিবিয়ে খেয়েছিলুম। আমরা বাঁধের ধারে গেছলুম ফেরবার সময় আর হাঁটতে পারি না। শেষটা একটা আলোর ওপর বসলুম দু-জনায়। দিদিমা আমার পায়ের গুলি ধরে নেড়ে দিল, অমনি আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। তারপর সেখান দিয়ে মটকাওয়ালা যাচ্ছিল, দিদিমা মটকা কিনে বলল কাল বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে যা। মাটকাওয়ালাকে চেনে আমার দিদিমা। তারপর আমরা মটকা চিবোতে চিবোতে বাড়ি চলে এলুম। এসে লুচি খেলুম। দিদিমা আমার জন্যে রোজ রাত্রে লুচি করে দিত। বলত, মাকে যেন আবার বলিসনে, সে হয়তো রোজ লুচি খেলে রাগ করবে। মাকে আমি কিছু বলিনি।

দিদিমা আমাকে বেড়াল কোলে নিয়ে শুতে দিত। পুষি আমার বালিশে মাথা রেখে আমার পাশে রোজ ঘুমোত। আর আজ দেখোনা পুষিকে আমার থালার কোনায় একটু খেতে দিয়েছিলুম বলে সে কী বকাবকি! তাই আমি আর এখানে থাকব না। রামধনু খুঁজে তার খুঁটির গোড়া থেকে সোনার ঘড়া বের করে তাই দিয়ে এক-শিংওয়ালা ঘোড়া কিনে, তাতে চেপে দিদিমার কাছে গিয়ে হাজির হবো। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যাবে না দিদিমা? আমি জানি, ওসব ঘড়া-টড়ার গল্প, এক-শিংওয়ালা ঘোড়ার গল্প দিদিমা সব বানিয়ে বলে। তাই সত্যি করে যখন এক-শিংওয়ালা ঘোড়া চেপে হাজির হব, কেমন চমকে যাবে না দিদিমা?

এই গল্পটি পড়ে কেমন লাগল? গল্পটি নিয়ে কি মনে কোনো প্রশ্ন তৈরি হয়েছে?

যা করব—

- গল্পটি নিয়ে নিজের অনুভূতি আর প্রশ্ন বন্ধুখাতায় লিখব। এগুলো নিয়ে ক্লাসের সকলের সাথে আলোচনা করব।
- গল্পটির মূল চরিত্রগুলো নিজের মতো করে আঁকতে হবে। বন্ধুরা মিলে আগে ঠিক করে নেবো কে কোন দৃশ্য আঁকব। ছবি এঁকে গল্পটির যেকোনো একটি দৃশ্য রচনা করব। মনে রাখতে হবে সবাই মিলে কিন্তু পুরো গল্পটি ছবি দিয়ে লিখতে হবে।
- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ছবির দৃশ্য ক্লাস রুমে প্রদর্শন করব। এর নাম দেবো চিত্রলেখা। কারণ ছবির মাধ্যমে পুরো গল্পটি লিখতে হবে। ছবিই হবে লেখার ভাষা।
- চিত্রশিল্পীরা যেমন নিজেদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে দর্শকদেরকে নিজের ভাবনা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন তেমনি আমরাও আমাদের চিত্রলেখার মাধ্যমে অনুভূতিটা শ্রেণিতে আগত দর্শকদের জানানোর চেষ্টা করব।

গল্পের সাথে ছবি এঁকে চিত্রকর হয়ে আমরা জানার চেষ্টা করেছিলাম চিত্রশিল্পীদের জগৎ সম্পর্কে। এখন আমরা জানব এমন এক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যিনি লিখেছিলেন কালজয়ী সব নাটক। যারা নাটকে বা সিনেমায় অভিনয় করেন তাদের বলা হয় অভিনয় শিল্পী আর যিনি নাটক রচনা করেন তাকে বলা হয় নাট্যকার।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী ছিলেন শিক্ষক, নাট্যকার, সুবক্তা, বাংলা কিবোর্ডের প্রবর্তক, ভাষা আন্দোলনের কর্মী এবং সর্বোপরি আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একজন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ১৯৫২ সালে কারাবরণ করেন। জেলে থাকাকালীন তিনি অধ্যবসায়ের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, জেলের ভেতর থেকে বাংলায় এমএ পরীক্ষায় অংশ নেন এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে আরেকটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

কারাবাসের সময় তিনি বাংলায় তাঁর বিখ্যাত প্রতীকী নাটক 'কবর' রচনা করেন এবং নাটকটি জেলখানাতেই মঞ্চস্থ হয়। তিনি পাকিস্তানি শাসকের সব ধরনের সাংস্কৃতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক হলো—রক্তাক্ত প্রান্তর , চিঠি, দণ্ডকারণ্য, মানুষ, নষ্ট ছেলে, রাজার জন্মদিন, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। নাটক ছাড়াও তিনি ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং বিদেশি নাটক অনুবাদ করেন।

তিনি ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দেওয়া তার পুরস্কার সিতারা-ই-ইমতিয়াজ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের বাঙালি সহযোগী আল-বদর, আল-শামস বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

চিত্রলেখা সম্পর্কে লিখি–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শরৎ উৎসব

শিউলি তলায় ভোরবেলায়
কুসুম কুড়ায় পল্লিবালা

কাজী নজরুল ইসলাম

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে আমরা কি কখনো দেখেছি, উঠোনের ঘাসগুলো এবং ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটা? মনে হয় হালকা বৃষ্টি হয়ে গেল এই কিছুক্ষণ আগেই। আসলে এগুলো বৃষ্টি ফোঁটা নয়, শিশির। এর মানে হলো বর্ষাকাল শেষ হয়ে শরৎ শুরু হয়ে গেছে। একটু রোদের আলো পড়তেই শিশিরগুলোকে মনে হয় মুক্তাদানা। যেন মুক্তোর মালা ছিঁড়ে পুরো উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের যাদের বাড়িতে, আশেপাশে অথবা বিদ্যালয়ে শিউলি গাছ আছে তারা তো জানি এই সময়টাতেই শিউলি ফুল ফোটে। ঝরেপড়া সাদা কমলা রঙ শিউলি ফুলগুলো গাছের তলায় তৈরি করেছে বিভিন্ন নকশা যা দেখতে অনেকটা আলপনার মতো। সেই শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। আমরা অনেকেই শিউলি ফুল কুঁড়িয়ে মালা ও বিভিন্ন গয়না বানাই, নিজে পরি, অন্যদেরও উপহার দেই। চলার পথে আরেকটা বিষয় কি খেয়াল করেছি? হয়ত বেশ ঝলমলে রোদের মাঝে হাঁটছি আমরা কিন্তু কোথা থেকে একখন্ড মেঘ উড়ে এসে হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে গেল। এই রোদ, এই বৃষ্টি এটাও শরতের লক্ষণ। শরৎকালেই এমনটা হতে দেখা যায়।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে

সকাল বেলায় ঘাসের আগায়, শিশিরের রেখা ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎ প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও কোমলতার প্রকাশ ঘটেছে বাঙালি লেখক-কবিদের বিভিন্ন গল্প ,উপন্যাস, গান, নাটক, কবিতা ও ছড়ায়। ধীরে ধীরে শরৎ একটা বিশেষ আয়োজন উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমরা শরৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি।

বাংলার প্রথম শরৎ অনুষ্ঠান উদযাপন হয় পুরান ঢাকায় ওয়ারীর বলধা গার্ডেনে। এখন এটি নিয়মিতভাবেই আয়োজন করা হয় চারুকলা অনুষদের বকুলতলাসহ বিভিন্নস্থানে।

কবিগুরু শরৎ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ছোটদের উপযোগী একটি চমৎকার নাটক রচনা করেছেন।

আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের এবারের শরৎ অনুষ্ঠানে এই নাটকটির একটি অংশ বেছে নিতে পারি –

শারদোৎসব

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে।
সাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক: ঠাকুর্দা, তুমি আমাদের দলে।
দ্বিতীয় বালক: না ঠাকুর্দা সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।
ঠাকুরদাদা: না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে-বয়ে গেছে।
আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।-

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা!

অন্য দল আসিয়া: ঠাকুর্দা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন? তোমার সঙ্গে আড়ি! জন্মের মতো আড়ি!
ঠাকুরদাদা: এতবড় দন্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্ ।-

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক: ঠাকুর্দা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।
দ্বিতীয় বালক: বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।
তৃতীয় বালক: আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না। (সংক্ষেপিত)

যা করব—

- প্রথমে আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব।
- একটি দল নাটকের চরিত্রগুলোতে অভিনয় করব। কেউ কেউ ছেলের দল হবো, একজন হবো ঠাকুরদা। আমরা সংলাপের মাধ্যমে এই নাটকটি উপস্থাপন করব।
- একটি জায়গাকে মঞ্চের জন্য নির্ধারণ করে একদল ছবি এঁকে মঞ্চ সাজাব। সাথে হাতের কাছে শরতের যা কিছু প্রাকৃতিক উপকরণ পাওয়া যায় তা দিয়ে মঞ্চ সাজানোর কাজ করব।
- এক দলের কয়েকজন ধানক্ষেত হতে পারি, কয়েকজন মেঘ হয়ে ভেসে যেতে পারি, কয়েকজন পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারি, কয়েকজন নৌকা বেয়ে চলার ভঙ্গি করতে পারি।
- একটি দল নাটকের থাকা গানটি গেয়ে সহযোগিতা করব।
- আরেকটি দল গানের কথা বুঝে সে অনুযায়ী নিজেরাই দেহভঙ্গি তৈরি করে পুরো গানটিকে উপস্থাপন করব, এতে আমরা একটি সৃজনশীল নৃত্য পরিবেশনা উপভোগ করতে পারব।

‘কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি’ পাঠে আমরা দাদরা তালের বোল সম্পর্কে জেনেছিলাম এই পাঠে আমরা দাদরা তালের সাথে নিচের সারগামটি মাত্রার সাথে অনুশীলন করব।

+				০		
১	২	৩		৪	৫	৬
সা	রে	গা	।	রে	গা	মা
গা	মা	পা	।	মা	পা	ধা
পা	ধা	নি	।	ধা	নি	র্সা
র্সা	নি	ধা	।	নি	ধা	পা
ধা	পা	মা	।	পা	মা	গা
মা	গা	রে	।	গা	রে	সা

সৃজনশীল ভঙ্গি

আমরা সাধারণত প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে থাকা বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভঙ্গি দেখি এবং শিখি। যেমন– নদী থেকে আমরা ঢেউয়ের ভঙ্গি দেখলাম এবং শিখলাম। এই ঢেউভঙ্গি আমরা কেউ হাত দিয়ে তৈরি করি, কেউ পা দিয়ে, কেউ কোমর দিয়ে, কেউ কাঁধ দিয়ে। এই যে একেকজন একেক ভাবে নদীর ঢেউটাকে ফুটিয়ে তুলছি এটাই সৃজনশীল ভঙ্গি।

এইভাবে গানের কথার অর্থ অনুযায়ী ভঙ্গি তৈরি করার যে প্রচলন অর্থাৎ সৃজনশীল ধারা সেটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন যিনি তাঁকে কি আমরা জানি? তিনি হলেন বাংলাদেশের গুণী নৃত্যপরিচালক বুলবুল চৌধুরী।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বুলবুল চৌধুরী

বুলবুল চৌধুরী ছিলেন আধুনিক নৃত্যের পথিকৃৎ। বাংলাদেশেরনৃত্য চর্চায় তাঁর অবদান ভোলা যায় না। তাঁর সমকালীন দেশের অনেক নৃত্যশিল্পীকে তিনি নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল খুবই কম। মাত্র ৩৫ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। বুলবুল চৌধুরী শুধু একজন নৃত্যশিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একধারে একজন নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকারও। তিনি একজন স্বশিক্ষিত নৃত্যশিল্পী ছিলেন।

নৃত্যকে তিনি সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে সহায়তাকারী শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন নৃত্যকে সবার কাছাকাছি নিতে হলে এর বিষয় নিতে হবে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে; নাচের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে অভিনয় বা অভিব্যক্তি। যেন তা যেকোনো ভাষা ও সংস্কৃতির দর্শকের কাছে সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ছোট কাহিনিভিত্তিক নৃত্য পরিকল্পনা করতে শুরু করেন; যেমন 'অজন্তা জাগরণ', 'মিলন ও মাথুর', 'তিন ভবঘুরে','হাফিজের স্বপ্ন', 'সোহরাব রোস্তম' ইত্যাদি।
রশিদ আহমেদ চৌধুরী আমাদের কাছে বুলবুল চৌধুরী নামে পরিচিত ১৯১৯ সালের চট্টগ্রামে সাতকানিয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দুই দশকেরও বেশি কর্মজীবনে তিনি প্রায় ৭০টি নৃত্যনাট্য রচনা ও কোরিওগ্রাফ করেছেন।

ভারত বিভাগের পর, তিনি ঢাকায় স্থায়ী হন এবং তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় নৃত্যশিল্পী হিসেবে ঘোষিত হন। তিনি বাংলাদেশে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

এই পাঠ থেকে জেনে আমি যা করলাম এবং শিখলাম তা লিখি–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সোনা রোদের হাসি

আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এই দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন এখনও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। কেউ নিজের জমিতে চাষ করে কেউ বা জমি বর্গা নেয়। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে পরম মমতায় কৃষক ফসল বুনে সে জমিতে। নিয়মিত পরিচর্যায় ধীরে ধীরে সোনালি রঙে রাঙা হয়ে ওঠে সবুজ ধানের খেত। ধান পাকার সময় হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জুড়ে পাকা ধানের সে সোনালি আলোয় কিষাণ-কিষানির মুখে ফোটে সোনালি হাসি। পল্লীকবি তাই কৃষকের মনের কথা বলেছেন–

মোর ধানক্ষেত, এইখানে এসে দাঁড়ালে উচ্চ শিরে,
মাথা যেন মোর ছুঁইবারে পারে সুদূর আকাশটিরে!
এইখানে এসে বুক ফুলাইয়া জোরে ডাক দিতে পারি,
হেথা আমি করি যা খুশী তাহাই, কারো নাহি ধার ধারি।
হেথায় নাহিক সমাজ-শাসন, নাহি প্রজা আর সাজা,
মোর ক্ষেত ভরি ফসলেরা নাচে, আমি তাহাদের রাজা।

-জসীমউদ্‌দীন

ফসলের রাজা কৃষকের জীবন সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে জানা দরকার। সেজন্য নিজেদের এলাকায় যদি কৃষিকাজ হয়, তবে কৃষকদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে পারি। তাদের জীবনের গল্প ও কাজ সম্পর্কে জানতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন বই, পত্রিকা পড়ে বা বাড়িতে মা-বাবা,দাদা-দাদির কাছ থেকেও আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারি। আবার কৃষক ও কৃষিকাজ নিয়ে যেসব গান, কবিতা ও গল্প আছে তা খুঁজে বের করতে পারি। সেসবের মধ্য থেকেও কৃষক, তার জীবন ও কাজ সম্পর্কে জানতে পারি। কৃষক ও তার জীবন নিয়ে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো বন্ধুখাতায় লিখে রাখতে পারি, প্রয়োজনে ছবিও এঁকে রাখতে পারি।

কৃষক আর ফসলের কথা জানার মধ্যদিয়ে আমরা আরো জানব গ্রাম বাংলার নবান্ন উৎসবের কথা। এই উৎসব মূলত লোকউৎসব। আমরা কি জানি লোকউৎসব কাকে বলে? কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনপদে বিভিন্ন ঋতুতে সকল মানুষের অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত উৎসব হলো লোকউৎসব।

হেমন্তকাল, চারিদিকে নতুন আমন ধানের মৌ মৌ ঘ্রাণ। চলে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের ধুম। কৃষকের মুখে ধান কাটার গান মনে করিয়ে দেয় নবান্ন উৎসবের কথা। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ হলো নতুন অন্ন। নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে তৈরি হয় চাল। সেই চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় নবান্ন উৎসব। নবান্নে নতুন ধান থেকে চালের গুঁড়া তৈরি করা হয় এবং চালের গুঁড়া থেকে পিঠা-পুলি পায়েস তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশীদের মিলে খাওয়ার আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। এছাড়া মুড়ি, চিড়া, নাড়ুও তৈরি হয়।

নবান্ন উপলক্ষ্যে অনেক গ্রামে মেলার আয়োজন হয়। মেলাতে পাওয়া যায় নানা রকম মণ্ডামিঠাই, পিঠাপুলি, খেলনা, পুতুল, মাটি, বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা জিনিস। এছাড়া পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে বসে কীর্তন, পালাগান ও জারি গানের আসর। বর্তমান সময়ে শহরেও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়। পিঠাপুলির আয়োজনের সাথে সাথে নাচ, গানের মধ্যদিয়ে পালন করা হয় শহরের নবান্ন উৎসব।

এবার আমরা একটা শ্রেণি উৎসবের আয়োজন করব যার নাম হবে 'আমার দেশের মাটির গন্ধে'

'আমার দেশের মাটির গন্ধে'

এবার নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণিকক্ষে আমরা এই উৎসবের আয়োজন করব। উৎসব আয়োজনের জন্য আমরা প্রথমে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব। এর পর দলের সবাই বসে নিজ এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো একত্রিত করব। সাথে সাথে আমাদের সংগ্রহ করা কৃষকদের নিয়ে রচিত গান, কবিতা, আঁকা ছবিসহ সব কিছুর তালিকা তৈরি করব।

এবার দলগতভাবে খুঁজে বের করব নিজের এলাকায় নবান্ন উৎসব হয় কিনা, যদি হয় তবে কীভাবে তার আয়োজন করা হয়? আগে কী হতো আর এখন কী হয়? এই সকল তথ্য জেনে তা বন্ধুখাতায় লিখে রাখব। নবান্ন নিয়ে যদি কোনো গান, কবিতা, গল্প বা নবান্ন উৎসবের সাথে যায় এমন কিছু পেলে তাও সংগ্রহ করে রাখব। এবার প্রত্যেকটা দল কৃষকের জীবন আর নবান্ন উৎসব নিয়ে আঁকা ছবি, সংগ্রহ করা গান, তার সাথে ভঙ্গিমা ইত্যাদি পরিবেশনের প্রস্তুতি নিবে। কোনো কোনো দল চাইলে অন্য সকল দলের সহায়তা নিয়ে উৎসবের দিন নিজেদের মতো করে মুড়ি, চিড়া, নাড়ু, পিঠাপুলি ইত্যাদির আয়োজন করতে পারি। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের কৃষকদের সম্মান জানাব আর কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতিকে নিজেদের ভিতরে ধারণ করব।

দলগতভাবে 'আমার দেশের মাটির গন্ধে' উৎসবটি আয়োজনের সাথে সাথে আমরা এককভাবে নিচের স্বরগুলো অনুশীলন করতে পারি। আগের পাঠে আমরা কাহারবা তালের বোল সম্পর্কে জেনেছিলাম। এই পাঠে আমরা কাহারবা তালে নিচের সারগামটা মাত্রার সাথে অনুশীলনের চেষ্টা করব।

+					০			
১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮
সা	রে	গা	রে	।	সা	রে	গা	গা
রে	গা	মা	গা	।	রে	গা	মা	মা
গা	মা	পা	মা	।	গা	মা	পা	পা
মা	পা	ধা	পা	।	মা	পা	ধা	ধা
পা	ধা	নি	ধা	।	পা	ধা	নি	নি
ধা	নি	র্সা	নি	।	ধা	নি	র্সা	র্সা

যা করব—

- নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে সবাই মিলে। পরিকল্পনাটি বন্ধুখাতায় লিখে রাখতে হবে।
- নিজ এলাকায় নবান্ন উৎসব কীভাবে হয় অথবা কোনো বন্ধুর এলাকায় নবান্ন কীভাবে হয় তা জেনে অনুষ্ঠান সাজাতে পারি।
- উৎসবে নবান্নের পিঠা-পুলির আয়োজন রাখতে হবে।
- নবান্নের গান, নাচ, কবিতা ও নাটক পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হবে।
- সারগাম অনুশীলন করব।
- নবান্ন উৎসবের ছবি আঁকা যেতে পারে।

মমতাজউদ্দীন আহমেদ

এই পাঠে আমরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মমতাজউদ্দীন আহমেদ সম্পর্কে জানব। তিনি সাধারণ মানুষের জীবন নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। তাঁর নাটকগুলো ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে। তিনি জগন্নাথ কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি থিয়েটার বিষয়ে পড়াতেন এবং গবেষণা করতেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে আধুনিক থিয়েটারের চর্চা করেন এবং তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি দিয়ে আমাদের নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেন।
রাজশাহী সরকারি কলেজে পড়াশোনা করার সময় ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন।স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সক্রিয়।

তিনি বেশিরভাগই তাঁর ব্যঙ্গাত্মক নাটক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অসঙ্গতি উন্মোচনকারী লেখাগুলোর জন্য পরিচিত। মমতাজউদ্দীন আহমেদ মঞ্চ, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য প্রায় ৪০টি নাটক লিখেছেন এবং এর মধ্যে বেশ কয়েকটি পরিচালনা করেছেন এবং কয়েকটি জনপ্রিয় টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন।

তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে– কি চাহো শঙ্খচিল, হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, সাত ঘাটের কানাকড়ি, বকুলপুরের স্বাধীনতা প্রভৃতি।

নবান্ন সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি–

আমার দেশে আমার বিজয়

বছর শেষে আসে আমাদের প্রিয় বিজয়ের মাস। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা পেয়েছি বিজয়। শুধু যে অস্ত্র হাতেই এই দেশের মানুষ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে তা নয়। কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাঁদের শিল্পকেই বানিয়েছিলেন যুদ্ধের হাতিয়ার। অস্ত্র নয় শিল্পই ছিল তাঁদের সংগ্রামের মাধ্যম। একদল সাংস্কৃতিককর্মী বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা নামে দল গঠন করে সীমান্ত এলাকায়, ট্রেনিং ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে ও সুযোগ হলে মাঠে প্রান্তরে গান গেয়ে সবার মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের সেই প্রেরণামূলক অবদান নিয়ে পরবর্তীতে তৈরি হয় একটি প্রামাণ্য চিত্র: ‘মুক্তির গান’।

এমনই আরেকটি সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানের সৈন্যদের হাতে সকল রেডিও স্টেশন চলে যায়। চট্টগ্রামের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রটিকে বেতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন কয়েকজন নেতা। এর নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।'

১৯৭১ সালের ২৮ শে মার্চ 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ১৯৭১ সালের ৩০ শে মার্চ হানাদার বাহিনীর বোমাবর্ষণের ফলে বেতার কেন্দ্রটি নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৫ মে কলকাতার বালিগঞ্জে বেতার কেন্দ্রটি ২য় পর্যায়ে সম্প্রচার শুরু হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তখন দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হতো, আরও কিছু অনুষ্ঠান হতো যার মধ্যে একটি হলো— চরমপত্র। শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমেই নয় বরং তৎকালীন শিল্পীরা তাঁদের বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে গেছেন। আমরা তাঁদের অবদানকেও স্মরণ করব।
মনে রাখতে হবে, শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম যে শুধু আমাদের মনের ভাষা, আবেগ অনুভূতি প্রকাশের বাহন তা নয় বরং আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। আবার কখনও হতে পারে আমাদের প্রতিবাদের ভাষা।

যা করব—

- মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন বই, পত্রিকা, গল্প, ছবি ইত্যাদি দেখে, শুনে ও পড়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা ও অনুভূতি লাভ করব।
- বিভিন্ন মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের অবদান সম্পর্কে জানব।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।
- মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত বই, পত্রিকা, গল্প ও ছবি দেখে, শুনে ও পড়ে তার আলোকে নিজের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আঁকা, গড়া লেখার চেষ্টা করব।
- মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত গান শুনব, গানের সাথে ভঙ্গির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে অনুভুতি প্রকাশের অনুশীলন করব।
- এই পাঠের শেষে আমরা একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করব।

বছর জুড়ে অনেক কিছু করেছি যার মাধ্যমে নিজের এলাকার অনেক বিষয়/আচার অনুষ্ঠান/শিল্পকর্ম/সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে খুঁজে পেয়েছি। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে হবে যে আমাদের করা কোন কোন বিষয়/ আচার অনুষ্ঠান/ শিল্পকর্ম নিয়ে আমরা বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করব।

বার্ষিক প্রদর্শনীতে উপস্থাপনের জন্য আমাদের আঁকা ছবি/গড়া/গাওয়া গান/নাচ/অভিনীত নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে দিকগুলো লক্ষ রাখতে হবে—

- যা আমাদের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ধারণ করে।
- যা আমাদের লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে।
- আমাদের কাজগুলোতে যেন সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার প্রকাশ থাকে।
- আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ থাকে এমন কাজ/উপস্থাপনা নির্বাচন করতে হবে।

জহির রায়হান চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক, ফেনী জেলায় ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম ১০ জন ছাত্রের একজন যাঁরা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই ধরনের কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মিছিলে বের হন। তাঁকে এবং আরও অনেককে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

ছাত্রজীবনে জহির সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম বই ‘সূর্যগ্রহণ’। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বই হলো— হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী ও আর কটা দিন। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটির জন্য তিনি আদমজী সাহিত্য পুরস্কার এবং বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।

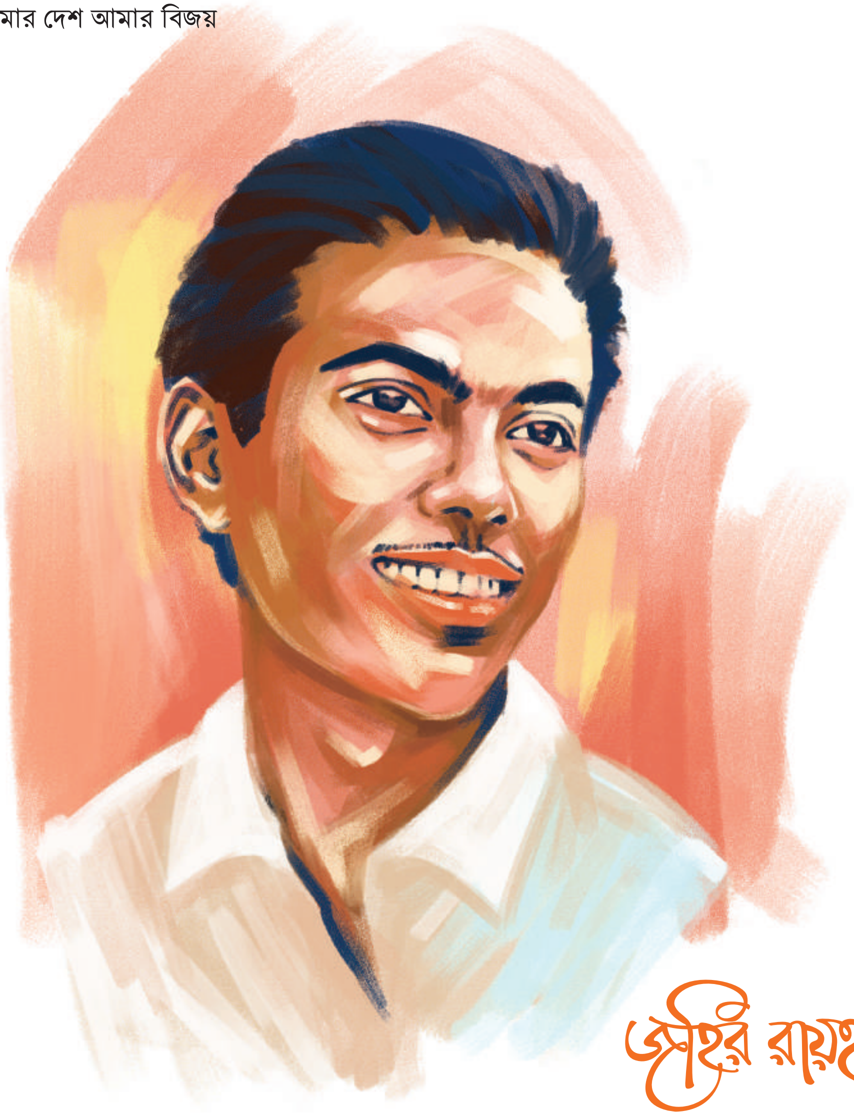

জহির রায়হান

তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি ‘কখনো আসেনি’ ১৯৬১ সালে মুক্তি পায়। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম রঙিন সিনেমা ‘সঙ্গম’ নির্মাণ করেন। তারপর একের পর এক আসে– সোনার কাজল, কাচের দেয়াল, বেহুলা, জীবন থেকে নেয়া, আনোয়ারা এবং বাহানা। ‘জীবন থেকে নেয়া’ ছবিতে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের চিত্র তুলে ধরেন এবং জনগণকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যাকে তুলে ধরে একটি তথ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’ নির্মাণ করেন। এই তথ্যচিত্রটি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ‘আ স্টেট ইজ বর্ন’ তাঁর তৈরি আরেকটি তথ্যচিত্র।

১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর বড় ভাই বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারকে ঢাকার মিরপুরে খুঁজতে গিয়ে তিনি আর কখনই ফিরে আসেননি। দিনটি জহির রায়হানের অন্তর্ধান দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

সারা বছরে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টিতে আমি যা শিখেছি তার মধ্য থেকে আমার সবচেয়ে পছন্দের একটি বিষয় সম্পর্কে লিখি–

শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক

বিশ্বজোড়া পাঠশালা

অধ্যায় শেষের শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর নাম: ______________________________

রোল নম্বর: ______________ তারিখ: ______________

শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুভূতি পড়ে এবং কাজ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে।	☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেছে।	☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।

শিক্ষকের স্বাক্ষর:

নকশা খুঁজি ও নকশা বুঝি

অধ্যায় শেষের শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর নাম: ______________________________

রোল নম্বর: ______________ তারিখ: ______________

শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুভূতি পড়ে এবং কাজ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:

☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে।	☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেছে।	☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।

শিক্ষকের স্বাক্ষর:

স্বাধীনতা আমার

অধ্যায় শেষের শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর নাম: ____________________

রোল নম্বর: ____________________ তারিখ: ____________________

শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুভূতি পড়ে এবং কাজ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:		
☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে।	☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেছে।	☐ ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
তার প্রকাশের আগ্রহ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:		
☐ যে ধারাণা পেয়েছে তার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে।	☐ ধারণার প্রতিলিপির প্রকাশ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে করতে পারে।	☐ ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।
সহপাঠী মূল্যায়ন		
☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মূল্যায়ন করেছে।	☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মূল্যায়ন করে নাই।	

শিক্ষকের স্বাক্ষর:

বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ

অধ্যায় শেষের শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর নাম: ____________________

রোল নম্বর: ____________________ তারিখ: ____________________

তার প্রকাশের আগ্রহ দেখে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:		
☐ যে ধারনা পেয়েছে তার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে।	☐ ধারণার প্রতিলিপির প্রকাশ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে করতে পারে।	☐ ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে যেকোন একটি শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।

শিক্ষকের সাক্ষর:

কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি

অধ্যায় শেষের শিখনকালীন মূল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর নাম: ____________________

রোল নম্বর: ____________ তারিখ: ____________

তার প্রকাশের সক্ষমতা বুঝে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:		
☐ নির্দেশনা মেনে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে।	☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে।	☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
ধারনার প্রয়োগ		
☐ শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশে যে প্রাথমিক ধারনা দেওয়া হয়েছে সে নির্দেশনা মানতে পারে।	☐ শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশে নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে উপস্থাপনা/শিল্পসামগ্রী বানিয়েছে।	☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
সহপাঠী মুল্যায়ন		
☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মূল্যায়ন করেছে।	☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মূল্যায়ন করে নাই।	

শিক্ষকের স্বাক্ষর:

শারদ উৎসব

অধ্যায় শেষের শিখনকালীন মুল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর নাম: ____________________

রোল নম্বর: ____________ তারিখ: ____________

তার প্রকাশের আগ্রহ বুঝে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:		
☐ যে ধারাণা পেয়েছে তার প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে।	☐ ধারণার প্রতিলিপির প্রকাশ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে করতে পারে।	☐ ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তার প্রকাশের সক্ষমতা বুঝে নিচের অংশটিতে টিক দিবেন:		
☐ নির্দেশনা মেনে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে।	☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশ করছে।	☐ নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে ধারণা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
ধারণার প্রয়োগ		
☐ শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশে যে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে সে নির্দেশনা মানতে পারে।	☐ শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশে নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পসামগ্রী/উপস্থাপনা বানিয়েছে।	☐ ধারাবাহিকভাবে শিল্পের যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশে নিয়ম-কানুন, উপাদান জেনে বুঝে, অনুসরণ করে শিল্পসামগ্রী/উপস্থাপনা বানিয়েছেন।
সহপাঠী মূল্যায়ন		
☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মূল্যায়ন করেছে।	☐ রুব্রিক্স দেখে দলীয় মূল্যায়ন করে নাই।	

শিক্ষকের স্বাক্ষর:

অভিভাবক কর্তৃক অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন

অভিভাবক শিক্ষার্থীর সাথে তার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের লেখার আগের বক্সে টিক চিহ্ন দিন—

☐ শিক্ষকের নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করেছে।

☐ এই পাঠ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছে।

☐ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কাজ করেছে।

☐ বাড়িতে নিজের কাজ গুছিয়ে করেছে

☐ এই পাঠে ---চর্চা করেছে।

☐ এই পাঠে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি রপ্ত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছে/প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করেছে---------

----

অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডল ও নিতুন কুণ্ডুর আঁকা মুক্তিযুদ্ধের যুগান্তকারী পোস্টার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট তৈরির কাজে যুক্ত হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুণ্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস ও বীরেন সোম। এই শিল্পীরা আঁকেন যুগান্তকারী সব পোস্টার, কার্টুন। এর মধ্যে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু আঁকলেন 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' আর শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা'। এই দুই পোস্টার হয়ে উঠল আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অসাধারণ প্রতিকৃতি। মনপ্রাণ-জাগানিয়া মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য শৈল্পিক দলিল সেই যুদ্ধ সময়ে তো বটেই, এখনও অনুপ্রাণিত করে দেশের মানুষকে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
দাখিল ৭ম শ্রেণি
শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য